সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১
কুরআন করীম এবং হাদীসের আলোকে মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমণের সংবাদ	২
লাহোরের 'সর্বধর্ম সম্মেলনের ঈমান উদ্দীপক ধারাবিবরণী	৩
পবিত্র যুদ্ধ - হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বনাম পাদ্রী আব্দুল্লাহ্ আথম -এর মাঝে ঐতিহাসিক মোবাহাসা	৭
শত্রুদের ধ্বংসের নিরিখে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সত্যতা	১২

সম্পাদকীয়

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

হযরত মসীহ মওউদ (আ)-এর পুরস্কার সম্বলিত চ্যালেঞ্জ

আমি প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান করেছি

إِنَّ السُّمُوْمَ لَشَرُّ مَا فِي الْعَالَمِ ۞ شَرُّ السُّمُوْمِ عَدَاوَةُ الصُّلَحَاءِ

কুরআন মজীদ, হাদীস এবং অতীতের ধর্মগ্রন্থগুলির ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে প্রেরণ করেন, যে যুগটি ছিল গভীর অন্ধকার, কুফর ও ভ্রষ্টতার যুগ। তাঁর সুমহান উদ্দেশ্যকে কুরআন মজীদ এই বাক্যে বর্ণনা করেছে-

لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ (সূরা সাফ, আয়াত: ১০) অর্থাৎ পৃথিবীর সকল ধর্মের উপর ইসলামকে জয়জুক্ত করার উদ্দেশ্যে। আঁ হযরত (সা.) তাঁর মহান উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন-

لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهٗ رِجَالٌ مِنْ هٰؤُلَاءِ

(বুখারী, কিতাবুত তফসীর, সূরা জুমা)

অর্থাৎ ঈমান যদি ধরাপৃষ্ঠ থেকে সপ্তর্ষি মণ্ডলেও চলে যায়, তবে এদের মধ্য থেকে কতক ব্যক্তি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবে। অপর এক বর্ণনায় 'রাজুলুন্' শব্দও এসেছে। অর্থাৎ এক মহান ব্যক্তি, মসীহ মওউদ ও মাহদী তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

'আমি এমন যুগে আবির্ভুত হয়েছি, যখন ইসলামের ধর্ম-বিশ্বাস মতভেদে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কোনও বিশ্বাসই মতভেদশূন্য ছিল না।.... আমার নিজের সত্যতার আর কোনও দলিল উপস্থাপন করা আবশ্যক ছিল না। কেননা প্রয়োজনীয়তা নিজেই দলিল।

(জরুরাতুল ইমাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড১৩, পৃ: ৪৯৫)

তিনি বলেন: খোদা তা'লা এই যুগকে অন্ধকারাচ্ছন দেখে এবং পৃথিবীকে উদাসীনতা, কুফর এবং শিরকে নিমজ্জিত দেখে এবং ঈমান, সত্যবাদিতা, তাকওয়া এবং সততার অবক্ষয় দেখে আমাকে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি পুনরায় পৃথিবীতে জ্ঞানগত, কর্মগত, চরিত্রগত এবং ঈমানগত সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন।

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৫, পৃ: ২৫১)

তিনি বলেন: এশিয়া হোক বা ইউরোপ কিম্বা আমেরিকা-আমি পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছি।

(তারইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃ: ৫১৫)

তিনি বলেন: তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক তবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনমূলক সেজদা কর। কেননা যে যুগের প্রতীক্ষা করতে করতে তোমাদের সম্মানিত বাপ-দাদাগণ গত হয়েছেন এবং অগণিত আত্মা যে যুগের জন্য আগ্রহ পোষণ করতে করতে চলে গেছেন, সেই যুগ তোমরা লাভ করেছ। এখন এর কদর করা বা না করা এবং এথেকে উপকার গ্রহণ করা বা না করা তোমাদের উপর নির্ভর করছে। একথা আমি বারবার বলব এবং এ ঘোষণা থেকে আমি কখনো বিরত হতে পারি না যে, আমি সেই ব্যক্তি যাকে যথাসময়ে মানুষের সংস্কারের জন্য পাঠানো হয়েছে, যাতে ধর্মকে সজীবভাবে মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

(ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৩, পৃ: ৮)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলামের বিজয়ের মহান লক্ষ্যের পূর্ণতার জন্য খোদার কাছে এত দোয়া এবং অনুনয় বিনয় করেন যে, আঁ হযরত (সা.) ছাড়া অন্য কোনও নবীর ক্ষেত্রে এমন উদাহণ পাওয়া যায় না। এছাড়াও তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন, ভাষণ দিয়েছেন, মোনাযারা মোবাহাসা করেছেন, হাজার হাজার সংখ্যায় ইশতেহার প্রকাশ করেছেন এবং আশিটির বেশি পুস্তক রচনা করেছেন। তিনি নিজের পুস্তক ও ইশতেহারগুলিতে ইসলাম, ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.), কুরআন করীম এবং নিজের সত্যতার প্রমাণের জন্য বহু পুরস্কারের চ্যালেঞ্জও দিয়েছেন। আমি এই প্রবন্ধে তাঁর দেওয়া পুরস্কারের চ্যালেঞ্জের উল্লেখ করব।

১৮৬৪-১৮৬৭ সালের মধ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিয়ালকোটে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু এখান থেকেই শুরু হয় তাঁর তবলীগি অভিযানের পথ চলা। খৃষ্টান পাদ্রীরা মুসলমান উলেমাদেরকে একের পর এক পরাজিত করত, কিন্তু একমাত্র হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সামনেই তারা সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ত। সিয়ালকোটের ধর্মীয় পরিবেশে তিনি একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। জনৈক প্রথিতযশা পাদ্রী বাটলার তাঁর অনুরাগী হয়ে পড়েন। তিনি প্রায় তাঁর বাণী শুনতে তাঁর কাছে চলে আসতেন। কিছু বিদ্বেষপরায়ণ মানুষ তাকে বাধা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পাদ্রী তাদেরকে উত্তর দেন: " এই ব্যক্তি অসাধারণ, অতুলনীয়। তোমরা এঁকে বুঝতে পার না, আমি খুব ভাল করে বুঝি।

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৯৩)

১৮৭২ সালে তিনি লেখনীর জেহাদের সূচনা করেন। বেঙ্গালোরের মনশুর মহম্মদী নামে একটি পত্রিকার ২৫ শে আগস্ট, ১৮৭২ সালের সংখ্যায় তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে সকল ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য ঘোষণা করা হয়েছিল। তিনি লেখেন-

"মানুষের সকল বিষয় এবং সম্পর্কে সত্যতাই যাবতীয় গুণাবলীর আধার। এই কারণে একটি সত্য ধর্মকে চিহ্নিত করার সহজ উপায় হল সেই ধর্মে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে কতটা জোর দেওয়া হচ্ছে এবং কতটা কার্যকরী উপায়ে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে তা দেখা। তিনি সমস্ত ধর্মকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, আমি প্রত্যেক সেই অ-মুসলিমকে ৫০০০ টাকা করে পুরস্কার দিতে রাজি আছি, যে তাদের স্বীকৃত ধর্মগ্রন্থ থেকে সেই শিক্ষামালার মোকাবেলায় অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশও উপস্থাপন করবে যা আমি ইসলামের স্বীকৃত ও নির্ভরযেগ্য বই-পুস্তক থেকে সত্যের বিষয়ে দেখাব।"

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৮)

৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭৭ সালে 'উকিল হিন্দুস্তান' এবং অন্যান্য সংবাদ

এরপর ১৭-এর পাতায়.....

যে খোদা আমাকে পাঠিয়েছেন এবং যাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা মহাপাপীর কাজ; আমি তাঁর শপথ করে বলছি, তিনি আমাকে মসীহ মওউদ রূপে পাঠিয়েছেন।

আল্লাহ্‌র বাণী

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

অনুবাদ: তুমি আমাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর, তাহাদের পথে, যাহাদিগকে তুমি পুরস্কৃত করিয়াছ, কোপগ্রস্তদের (পথ) নহে, এবং পথভ্রষ্টদেরও (পথ) নহে।

(সূরা ফাতিহা, আয়াত: ৬-৭)

۞ وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ

এবং (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ্ নবীদের (মাধ্যমে লোকদের) নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন (এই বলিয়া, কিতাব হিকমত হইতে যাহা কিছু আমি তোমাদিগকে দিই, অতঃপর তোমাদের নিকট এমন রসূল আসে যে সেই বাণীর সত্যায়ন করে যাহা তোমাদের নিকট আছে, তখন তোমরা নিশ্চয় তাহার উপর ঈমান আনিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে। ' তিনি বলিলেন, তোমরা কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে, এবং এই বিষয়ে তোমরা তোমাদের প্রতি ন্যস্ত আমার প্রদত্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করিলে? তাহারা বলিল, 'আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম। তিনি বলিলেন তেমরা সাক্ষী থাক এবং আমি তোমাদের সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত রহিলাম।" (আলে ইমরান: ৮২)

۞ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۔ (النساء:70)

অনুবাদ: এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের আনুগত্য করিবে তাহারা ঐ সকল লোকদের মধ্যে শামিল হইবে যাহাদিগকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করিয়াছেন অর্থাৎ নবীগণ এবং সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ এবং সালেহগণের মধ্যে। এবং ইহারাই সঙ্গী হিসাবে উত্তম।

(আন নিসা: ৭০)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

۞ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَنْزِلَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا وَاِمَامًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضُ الْمَالَ حَتّٰى لَا يَقْبَلَهٗ اَحَدٌ۔

অনুবাদ: হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যতদিন পর্যন্ত না ঈসা ইবনে মরিয়ম ন্যায় বিচারক ও ইমাম হিসেবে আবির্ভূত হন, ততদিন কিয়ামত আসবে না। (যখন তিনি আবির্ভূত হবেন) তিনি ক্রুশ ভঙ্গ করবেন, শূকর বধ করবেন , জিযিয়া উচ্ছেদ করবেন এবং এমন সম্পদ বিতরণ করবেন যা লোকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবে না।

(সুনানে ইবনে মাজা, কিতাবুল ফিতন)

۞ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ يَمَانٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا مَضَتْ اَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَاَرْبَعُوْنَ سَنَةً يَبْعَثُ اللّٰهُ الْمَهْدِىَّ-

অনুবাদ: হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান (রা.) বর্ণনা করেন যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: আল্লাহ্ তা'লা ১২৪০ বছর পর মাহদীকে প্রেরণ করবেন।

(আননাজমুস সাকিব, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০৯)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.)-এর পরে কেয়ামত পর্যন্ত নতুন শরীয়তসহ কোন নবী বা রসূল আসবে না; অথবা কোন ব্যক্তি নবী নাম লাভের অধিকারী হবে না, যিনি আঁ হযরত (সা.)-এর অনুসরণ না করেন এবং এমন 'ফানাফির রসূল' অর্থাৎ আঁ হযরত (সা.)-এর মধ্যে বিলীন হয়ে না যান, যার ফলে আকাশে তাঁর নাম মুহাম্মদ (সা.) রাখা হয়।

'ওয়া মানিদ দাআ ফাকাদ্ কাফারা' [এবং যে (স্বতন্ত্রভাবে) দাবী করে সে নিশ্চয়ই কাফির] এর মধ্যে আসল তত্ত্ব এই যে, খাতামান্নাবীঈন শব্দের মর্মানুযায়ী স্বাতন্ত্রের লেশমাত্র বাকী থাকতে কোন ব্যক্তি নবুয়তের দাবী করলে, সে খাতামান্নাবীঈন-এর মোহর ভঙ্গকারী হবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ খাতামান্নাবীঈন এর মধ্যে এরূপ বিলীন হয়ে যান যে, তাঁর সাথে একান্ত একীভূত হয়ে এবং স্বীয় স্বাতন্ত্রের পূর্ণ বিলোপ সাধন দ্বারা তাঁরই নাম লাভ করেন এবং পরিণামে স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় তাঁর সত্তায় আঁ হযরত (সা.)-এর ছবি ফুটে উঠে, তাহলে মোহরকে না ভেঙ্গেই তিনি নবী আখ্যায়িত হবেন, কারণ প্রতিচ্ছায়ারূপে তিনি মুহাম্মদ (সা.)। মুহাম্মদ ও আহমদ নামে অভিহিত এই প্রতিবিম্বিত ব্যক্তি নবী ও রসূলের দাবী সত্ত্বেও সৈয়্যাদানা মুহাম্মদ (সা.)-ই খাতামান্নাবীঈন থাকেন। কেননা এই দ্বিতীয় মুহাম্মদ (সা.) সেই প্রথম মুহাম্মদ (সা.)-এরই প্রতিকৃতি এবং তাঁর নামে আখ্যায়িত। কিন্তু ঈসা (আ.) স্বতন্ত্র নবী হওয়ার ফলে খতমে নবুয়তের মোহর না ভেঙ্গে তিনি আসতে পারেন না। যদি বুরুজী রঙেও কেউ নবী বা রসূল হতে না পারে তাহলে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ প্রার্থনার অর্থ কি? অতএব স্মরণ রাখতে হবে যে মুহাম্মদ (সা.) -এর প্রতিবিম্বরূপে আমি নবী বা রসূল হওয়া অস্বীকার করি না। এই অর্থেই সহী মুসলিমেও প্রতিশ্রুত মসীহকে নবী বলা হয়েছে।

আল্লাহ্ হতে যিনি গায়েবের সংবাদ পান, তাঁর নাম নবী না হলে কী নামে তাঁকে অভিহিত করা যাবে? যদি বল তাঁকে 'মুহাম্মাদস' বলা উচিত তাহলে আমি বলতে চাই যে, কোন অভিধানেই 'তাহদীসের' অর্থ গায়েবের সংবাদ দেওয়া নয়; কিন্তু নবুয়তের অর্থ গায়েবের সংবাদ দেওয়া। নবী আরবী ও হিব্রু, উভয় ভাষার শব্দ। হিব্রুতে এ শব্দের উচ্চারণ 'নাবী' এবং এটা 'নাবা' ধাতু হতে উৎপন্ন হয়েছে। এর অর্থ আল্লাহ্‌র নিকট হতে জেনে গায়েবের সংবাদ দেওয়া। নবীর জন্য শরীয়তদাতা হওয়ার শর্ত নেই। নবুওয়ত আল্লাহ্‌র অপার্থিব দান। এর দ্বারা গায়েবের সংবাদ ব্যক্ত হয়।

সুতরাং আমি যখন আজ পর্যন্ত খোদার নিকট হতে প্রায় দেড়শত ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করে স্বচক্ষে পূর্ণ হতে দেখেছি। তখন আমার নবী ও রসূল হওয়া আমি কিরূপে অস্বীকার করতে পারি? যখন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নবী ও রসূল আখ্যা দিয়েছেন,তখন কিরূপে এটা প্রত্যাখ্যান করতে পারি এবং তাঁকে ছেড়ে অন্যকে ভয় করি? যে খোদা আমাকে পাঠিয়েছেন এবং যাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা মহাপাপীর কাজ; আমি তাঁর শপথ করে বলছি, তিনি আমাকে মসীহ মওউদ রূপে পাঠিয়েছেন। আমি যেভাবে কুরআন শরীফের আয়াতের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখি সেরূপ বিন্দুমাত্র পার্থক্য না করে আমার প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র প্রত্যেকটি পরিষ্কার ওহীর উপর ঈমান রাখি। এগুলোর সত্যতা অবিরাম নিদর্শনের দ্বারা আমার নিকট সুপ্রকাশিত হয়েছে। আমি কাবা গৃহে দাঁড়িয়ে শপথ করতে পারি যে, যে সব পবিত্র ওহী আমার নিকট অবতীর্ণ হয়, এগুলো সেই আল্লাহ্‌র বাণী যিনি হযরত মূসা, হযরত ঈসা এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি আপন বাণী প্রেরণ করেছিলেন। পৃথিবী আমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। আকাশও আমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। পৃথিবী ও আকাশ উভয়েই ঘোষণা করেছে আমি আল্লাহ্‌র খলীফা। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমাকে প্রত্যাখ্যান করাও অবধারিত ছিল। যাদের হৃদয়ের উপর পর্দা পড়েছে তারা আমাকে গ্রহণ করবে না। যেভাবে খোদা তাঁর নবীগণকে সাহায্য করেন, আমি জানি নিশ্চয়ই তিনি আমাকেও সেভাবে সাহায্য করবেন। আমার বিরুদ্ধে কেউ টিকতে পারবে না। কারণ আল্লাহ্‌র সমর্থন তাদের সঙ্গে নেই।

(এক গলতি কা ইযালা,রূহানী খাযায়েণ, খণ্ড-১৮,পৃ: ৮)

*****❖*****❖*****❖*****

লাহোরের ঐতিহাসিক সর্বধর্ম সম্মেলন-এর ঈমান উদ্দীপক ধারাবিবরণী

ভাই আব্দুর রহমান কাদিয়ানী (রা.)-এর লেখনী

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগান্তকারী রচনা 'ইসলামী ওসূল কি ফিলাসফী' সম্পর্কে হযরত ভাই আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়ানী (রা.), যিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন, ১৯৪৬ সালের ২০ শে জুলাই 'সর্বধর্ম সম্মেলন, লেকচার ইসলামি ওসূল কি ফিলাসফী' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, যেটি সীরাতুল মাহদীর ২য় খণ্ডে লিপিবদ্ধ আছে। এই প্রবন্ধে তিনি জলসা এবং লেকচারগুলির ঈমান উদ্দদীপক ধারাবিবরণী বর্ণনা করেছেন।

১) সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মধ্যে খোদার বাণী ও ধর্ম প্রচারের জন্য যে উন্মাদনা ও ব্যগ্রতা ছিল, তা বর্ণনা করা মানবীয় শক্তির উর্দ্ধে। ইসলামকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করে দেখানোকেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর কাজ ও দায়িত্ব হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

হুযুর নুর যথার্থরূপে প্রচারের কাজে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেন নি , আর না তিনি অবহেলা করেছেন। অহর্নিশি তিনি এই চিন্তাতেই মগ্ন থাকতেন, তবলীগের কোনও সুযোগ কখনও তিনি হাতছাড়া করেন নি। তিনি সর্বাবস্থায় কেবল এই চিন্তাতেই মগ্ন থাকতেন। তাঁর জীবনপাতার প্রতিটি ঘটনা, জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত এর জলজ্যন্ত সাক্ষী। দীর্ঘ অধ্যয়ন ও হুযুরের রচনাবলীর গভীরতাকে পৃথক রেখে স্বচ্ছ অন্তঃকরণে বিদ্বেষমুক্ত হয়ে যদি তাঁর একটি দুই পৃষ্ঠা বিশিষ্ট ইশতেহারকেই দেখি, তবে নিঃসন্দেহে আমার এই বর্ণনাকে সত্য বলের স্বীকার করতে হবে। হুযুর (আ.)-এর এই ব্যকুলতা ও নিষ্ঠার পরিণামেই আল্লাহ্ তা'লা সর্বতোভাবে তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন করেছেন। হুযুর (আ.) প্রায়শই খোদার এই কৃপা ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে বলতেন-

" খোদার কিরূপ অপার কৃপা ও অনুগ্রহ, যখনই আমার মনে কোনও বাসনার উদ্রেক হয়েছে বা কোনও প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা তৎক্ষণাৎ তা পূর্ণ করার উপকরণ তৈরী করেছেন।"

২) ১৮৯২ সালের দ্বিতীয়ার্ধে কাদিয়ানে শোগন চন্দ্র নামে হঠাৎই এক গেরুয়া বসনধারীর সাধুর আগমণ ঘটল, যিনি খুব কম সময়ের মধ্যেই আমাদের বৈঠকগুলিতে অবাধে যাতায়াত আরম্ভ করলেন। কোনও কোনও দিন সৈয়্যদানা হযরত মৌলানা হাকীম নুরুদ্দীন (রা.)-এর বৈঠকেও অংশ গ্রহণ করেছেন, আবার পরের দিনই তিনি সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে সকাল ও বিকেলের পদ-ভ্রমণে যোগ দিয়ে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কেননা সেই সত্যান্বেষী ব্যক্তি তাঁর আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্তে স্বর্গীয় বারিধারার সন্ধানে ভুবন ঘুরে অবশেষে কাদিয়ানের পবিত্র তীর্থভূমিতে এসে পৌঁছেছিলেন নিজের উদ্দেশ্য পূরণের আশা নিয়ে, কিছু অর্জন করার সংকল্প নিয়ে। তাঁর এই সৎ উদ্দেশ্যের পরিণামেই একেবারে বিজন হওয়া সত্ত্বেও খুব কম সময়ের মধ্যেই তিনি সকলের কাছে গৃহীত হলেন। গেরুয়া বসনে নিজের দারিদ্র গোপনকারী তিনি কেবল একজন সাধু ছিলেন না, কিম্বা অর্থের প্রলোভন ও কাদিয়ানে ধন-ভাণ্ডার বিতরণের সংবাদ তাঁকে এখানে টেনে আনে নি। বরং তিনি সত্যিকার অর্থেই একজন সত্যান্বেষী ছিলেন, অন্যথায় খোদার সম্মানিত সেই প্রত্যাদিষ্ট মসীহ অকারণেই তাঁর প্রতি ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হতেন না, যিনি খোদা প্রদত্ত জ্যোতি ও পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেন।

৩) শোগন চন্দ্র একজন শিক্ষিত ও বিবেকবান ব্যক্তি ছিলেন, যিনি সরকারের এক ভদ্রস্থ পদে আসীন ছিলেন। কিছু ঘটনাপ্রবাহ, জগতের নশ্বরতার ধারণা তাঁর মন-মস্তিস্ককে আচ্ছন্ন করে তোলে। তাঁর স্ত্রী-সন্তান এমনকি আত্মীয়-স্বজনরা পর্যন্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে, তিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। মনের মধ্যে ওঠা আলোড়ন অজ্ঞাতসারেই লালিত হতে থাকে। নশ্বর বস্তুসমূহের প্রভাব তাঁর চিন্তাধারার অভিমুখকে এক অবিনশ্বর ও চিরন্তন সত্তার সন্ধানের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, যার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি চাকরী ও সংসার ত্যাগ করে সত্যের সন্ধানে ব্রতী হন, এবং সন্ন্যাস-জীবন ধারণ করে ইতস্তত ভ্রমণে বের হন। কতকাল ও কোন্ কোন জগত ভ্রমণ করেছেন তা আমাদের কাছে অজানাই। তিনি কি কি দেখেছিলেন আর শুনেছিলেন, তা বলা যায় না। অতঃপর কেউ তাঁকে আমাদের প্রভু র সন্ধান ও কাদিয়ানের ঠিকানা দিয়েছিল, যার পরিণামে তিনি সত্য অন্তকরণে, নিষ্ঠা ও ভক্তিভরে এখানে পৌঁছে নিজ জীবনের উদ্দেশ্য পুরণের চেষ্টায় রত হন। হুযুর (আ.)-এর সান্নিধ্যে আশিসধন্য হয়ে তাঁর প্রতি এতটাই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন যে, সকল আনন্দ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ তাঁরই সহচার্য ও পবিত্র বাণীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, যার কারণে তিনি এখানেই থেকে যেতে মনঃস্থির করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁর দ্বারা স্বীয় নিদর্শন প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন যার নিমিত্তে সেই পবিত্র সত্তা পৃথিবীতে এত অলৌকিক পরিবর্তন করে এক ব্যক্তিকে কাদিয়ান পৌঁছে দিয়েছিলেন, যিনি কখনও লালা, কখনও মিস্টার এবং অবশেষে স্বামী শোগন চন্দ্র নামে আখ্যায়িত হয়েছেন।

৪) অতিথিপরায়ণতা নবীদের বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে। হুযুর (আ.) এই গুণে পরম ঔৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন সদাচার, অনুগ্রহ এবং বিনয়ের মূর্তপ্রতীক। মনোতুষ্টির পাশাপাশি মানবজাতির প্রতি তাঁর সহানুভুতির আবেগ ছিল অনন্য সাধারণ। উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট ছাড়াও সত্য, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভাণ্ডার খোদার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং খোদা দরবারে গ্রহণীয়তার প্রমাণ ছিল। এই সমুদয় সত্যের পাশাপাশি খোদার সঙ্গে বাক্যালাপ ও ঐশী সম্ভাষণে সম্মানিত হওয়া এবং দোয়ার গ্রহণীয়তা এমন আশীর্বাদ ছিল, যা প্রত্যেক পুণ্যবান ও সৎ প্রবৃত্তির মানুষকেই প্রভাবিত করত। বস্তুত এই বিষয়টিকেই অজ্ঞ জগতবাসী জাদু-মন্ত্রের নাম দিয়ে মানুষকে দূরে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। স্বামী শোগন চন্দ্রও এই সকল ঐশী নিদর্শনের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। যে জিনিসের তিনি অন্বেষণ করছিলেন, পৃথিবীর অন্যত্র না পেয়ে অবশেষে খোদার বিশেষ প্রজ্ঞার অধীনে কাদিয়ানে তার সন্ধান পেলেন। তিনি সেখানে সেই সব কিছু দেখলেন যা পৃথিবীর আর কোথাও কখনও দেখেন নি। তিনি নিজের সৌভাগ্য নিয়ে উচ্ছ্বসিত ছিলেন, কেননা তিনি যে বিষয়ের আকাঙ্খা করছিলেন, যা অন্বেষণ করছিলেন, অবশেষে খোদা তা'লা তাঁকে তা দান করেছেন। কিন্তু আমাদের হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তার থেকে বেশি আনন্দিত ছিলেন খোদার এই কৃপার কারণে যে, তিনি তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ করার জন্য শোগন চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন।

৫) হুযুর (আ.)-এর দীর্ঘলালিত আকাঙ্খা ছিল সর্বধর্ম সমন্বয় সম্মেলনের, যেখানে কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব, অলৌকিক নিদর্শন ও ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করার সুযোগ পাওয়া যাবে। আর প্রত্যেক ধর্মের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ ধর্মের সৌন্দর্য বর্ণনা করবে যাতে প্রতিযোগিতার এই ময়দানে আল্লাহ্র বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্যতা প্রকাশিত হয়। হুযুর (আ.)-এর বাসনা পূর্ণ করার নিমিত্তে আল্লাহ্ তা'লা স্বামী শোগন সাহেবকে কাদিয়ান প্রেরণ করেন, যিনি এই প্রস্তাবকে সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নিরুপণকারী প্রকৃত কষ্টি-পাথর হিসেবে বিশ্বাস করেছিলেন এবং এই সম্মেলনের আয়োজনে নিজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি এই কাজে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমত তিনি হিন্দু ছিলেন, উপরন্তু গেরুয়া পরিধান, এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কারণে হিন্দুদের

প্রত্যেক চিন্তাধারা এবং শ্রেণীর উপর তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। যার ফলে তাঁর প্রস্তাবকে বিবেচনাপূর্বক দেখা হল এবং এই কাজের জন্য আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেল। কেন্দ্রীয় নির্দেশাবলী এবং পরামর্শ তাঁর সামনে আসা বাধা-বিপত্তি দূর করতে সহায়ক হয়েছিল। তিনি কখনও সতর্কতা হিসেবে নিজে কাদিয়ান আসতেন, আবার কখনও বিশেষ দূতের মাধ্যমে তাঁর চাহিদাবলীর ব্যবস্থা করা হতে থাকে। ক্রমে আকাঙ্খিত সম্মেলন আয়োজনের রূপরেখা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। হুযুর (আ.)-এর নির্দেশনায় একটি রূপরেখা তৈরী করা হয়। কর্মী ও খরচের সিংহভাগের ব্যবস্থা স্বয়ং হুযুর (আ.)-এর পক্ষ থেকে হতে দেখে এমনটি প্রতিভাত হয় যেন রূপরেখাটিতে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। এই রূপে স্বামী শোগন চন্দ্র সাহেব হুযুর (আ.)-এর এই ধর্মীয় বাসনা পূরণে অদৃশ্য থেকে আগত একজন ফেরেশতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

৬) অবশেষে খোদার নাম নিয়ে দুর্গম পথ পেরিয়ে, বহু জটিলতা ও বাধা-বিপত্তি জয় করে এই জলসা অর্থাৎ 'প্রমূখ ধর্মসমূহের সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হওয়ার নির্ঘন্টও ঘোষিত হল। লাহোরের টাউন হলে ১৮৯৬ সালের ২৬ থেকে ২৮ ডিসেম্বর সম্মেলনের দিন নির্ধারিত হল। সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ ও শীর্ষনেতাদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন হওয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে হযরত মসীহ এতটাই আনন্দিত হয়েছিলেন যেন তিনি সমগ্র জগতের সাম্রাজ্য হাতে পেয়েছেন।

অতঃপর হুযুর (আ.) এই জলসার জন্য প্রবন্ধ রচনা করতে মনস্থির করলেন, কিন্তু ঐশী প্রজ্ঞার অধীনে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর এই অসুস্থতা দীর্ঘ সময় তাঁকে ভুগিয়েছিল। কিন্তু জলসা দিনক্ষণ যেহেতু সন্নিকটে ছিল, আর প্রবন্ধ লেখা পাছে অসম্পূর্ণ না থেকে যায়, এই আশঙ্কাও ছিল, তাই তিনি অসুস্থ অবস্থাতেই প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করে দেন। হযরত মৌলানা মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকুটি সাহেব (রা.) সেই সময় কোনও প্রয়োজন বিশেষে সিয়ালকোট গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে, তিনি হয়তো জলসায় পৌঁছতে পারবেন না। কাজে দীর্ঘ পরামর্শ ও বিবেচনার পর এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, খাজা কামালুদ্দীন সাহেব হুযুর (আ.)-এর প্রবন্ধ পাঠ করবেন। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে,

ক) হযরত মুনশী জালালুদ্দিন সাহেব বুলানি (গুজরাত) হুযুর (আ.)-এর প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করে হযরত পীর জি সিরাজুল হক সাহেবের নোমানীর হাতে তুলে দিবেন সুন্দর হরফে লিখে দেওয়ার জন্য, যাতে প্রবন্ধ পাঠের সময় খাজা সাহেবের কোনও অসুবিধা না হয়। কিন্তু হুযুর (আ.) পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রবন্ধ রচনায় যখন কিছুটা ব্যাঘাত ঘটল, তখন এই দুই সঙ্গীরা মিলে তা পূর্ণ করেন।

খ) এই প্রবন্ধে যতগুলি কুরআনের আয়াত,হাদীস বা আরবী বাক্য ছিল, সেগুলিকে পৃথকভাবে সুন্দর হরফে লিখে খাজা সাহেবকে মুখস্ত করানো হোক, পাছে জলসায় পড়ার সময় কোনও প্রকার ত্রুটি ও বিঘ্ন প্রবন্ধকে নিরানন্দ ও প্রভাবহীন করে দেয়।

৭) সুন্দর হরফে লেখা হুযুরের এই প্রবন্ধ প্রাতঃভ্রমণের সময় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শোনানো হত। আর হুযুর (আ.) যখন কোন পুস্তক রচনা করতেন বা ইশতেহার প্রকাশ করতেন, সেগুলিকে বৈঠকে বার বার পড়ে শোনাতেন। এটিই ছিল তাঁর রীতি। এমনকি নিয়মিত উপস্থিত হওয়া খুদ্দামরা সেই প্রবন্ধ আত্মস্থ করে ফেলত। সেই দিনগুলিতে প্রাতঃভ্রমণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল কাদিয়ানের উত্তরে অবস্থিত 'বিড়' মৌজা । আর এই প্রবন্ধটি শোনার উদ্দেশ্যে কাদিয়ানের সদস্য ও অধিকাংশ অতিথিই অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে প্রাতঃভ্রমণে অংশ গ্রহণ করত। পথ চলতে চলতেই হুযুর (আ.) প্রবন্ধের কোনও কোনও অংশের ব্যাখ্যা করে দিতেন, যা লেখনী ও বক্তব্যের নতুন নতুন বিষয়(পয়েন্ট), বিস্ময়কর তত্ত্বজ্ঞান, ঈমান-উদ্দীপক ঘটনা ও দলিল-প্রমাণের সমন্বয় ছিল। সেই সময়ের প্রাতঃভ্রমণে, যখন হুযুর (আ.) অসুস্থতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও বের হতেন, পরে জানা যায় যে মৌলবী আবু সাঈদ মহম্মদ হোসেন বাটালবীর কয়েকজন চরও হুযুর (আ.)-এর এই প্রবন্ধ শুনে তাকে গোপনে সংবাদ পৌঁছে দিত। হুযুর (আ.) যে আয়াতগুলির অধিকাংশকে মুক্তোমালার মত সাজিয়ে এক একটি বিষয় প্রমাণ করেছেন, সেগুলিকে মৌলবী সাহেব নিজের রচনায় একত্রিত করেছেন ঠিকই, কিন্তু সেগুলির স্থান-পাত্র-কাল বিবেচনায় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ঠেকেছে।

৮) খাজা কামালুদ্দিন সাহেব প্রবন্ধ পাঠ করতেন, পড়ার কৌশল রপ্ত করার অনুশীলন করতেন। তিনি চেষ্টা করতেন পাঠ করার পদ্ধতিতে কোনও অভিনবত্ব নিয়ে আসতে, যাতে শ্রোতারা বেশি প্রভাবিত হয়। কুরআনের আয়াত, হাদীস বা আরবী বাক্য রপ্ত করতে চেষ্টা করতেন। উর্দু পাঠে তিনি সাবলীলভাবে দক্ষ ছিলেন ঠিকই, কিন্তু কুরআনের আয়াত পাঠ করার ক্ষেত্রে চেষ্টা করা সত্ত্বেও অনেক ভুল-ভ্রান্তি ছিল যা তিনি অনেক আগ্রহভরে পরিশ্রম করেও দূর করতে পারেন নি। উপরন্তু সেই দিনগুলিতেই তাঁর কিছু খাঁটি বন্ধুদের মুখ থেকে একথা প্রকাশ পায় যে, খাজা সাহেব প্রবন্ধের ঔৎকর্ষতা, শ্রেষ্ঠতা ও প্রকৃষ্টতা নিয়েই সন্দিহান ছিলেন, তাঁর বাচনভঙ্গিতে যার প্রভাব পড়া অনিবার্য ছিল। আর একথা যদি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কানেও পৌঁছে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

৬) জলসার মাত্র কয়েকদিন পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা হুযুর (আ.)কে ইলহামের মাধ্যমে এই প্রবন্ধ সম্পর্কে সুসংবাদ দান করলেন, "এটি সেই প্রবন্ধ যা সকলের উপর জয়যুক্ত হবে" এর গ্রহণীয়তা অন্তরে স্থান পাবে। আর এটি সত্যের নিদর্শন হিসেবে গণ্য হবে। ১৮৯৬ সালের ২২ শে ডিসেম্বর হুযুর (আ.) 'সত্যান্বেষীদের জন্য এক মহা-সুসংবাদ' শিরোণামে এক ইশতেহার লিখে লিপিকারের হাতে তুলে দেন এবং এই অধমকে ডেকে পাঠিয়ে এই সম্মান দান করে বলেন,

" মিঞা আব্দুর রহমান! এই ইশতেহারটি ছেপে নিজ দায়িত্বে লাহোর নিয়ে যাও এবং খাজা সাহেবকে (যাঁকে জলসার ব্যবস্থাপনা দেখার জন্য একদিন পূর্বে লাহোর পাঠানো হয়েছিল) পৌঁছে দিয়ে আমার পক্ষ থেকে নির্দেশ দিও যে, 'এটিকে ব্যাপকহারে প্রচার করুন। প্রয়োজনে সেখানেই আরও ছাপিয়ে নিন। আমার পক্ষ থেকে তাঁকে ভালভাবে তাকিদ করো, কেননা, তিনি অনেক সময় গুটিয়ে পড়েন। বারবার এবং উচ্চস্বরে এই বার্তা পৌঁছে দিবেন যে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মানুষের বিরোধীতার চিন্তা এই কাজে যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। এটি মানবীয় কাজ নয় যা কারো বাধায় থেমে যাবে, এটি খোদার কাজ যা পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।"

১০) প্রায় মাঝরাতে ইশতেহার প্রস্তুত হয় আর আমি তা সঙ্গে নিয়ে তখনই পায়ে হেঁটে বাটালার উদ্দেশ্যে রওনা হই। ২২ ডিসেম্বর দ্বিপহরের কাছাকাছি সময় আমি লাহোর পৌছই। খাজা সাহেব সেই সময় লাহোরের বিখ্যাত মসজিদ মসজিদ উজির খান-এর পশ্চাতে একটি সংকীর্ণ গলিতে অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁকে সন্ধান করে খুঁজে বার করে ইশতেহারের বান্ডিল এবং হুযুর (আ.)-এ নির্দেশ ভালভাবে শুনিয়ে দিই, এমনকি পুনরাবৃত্তিও করি। খাজা সাহেবের সঙ্গে আরও দুই জন বন্ধুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, যাদের নাম আমার স্মরণে নেই। খাজা সাহেব ইশতেহারের বান্ডিল খুলে এর বিষয় বস্তু পড়ে দেখলেন। আমি লক্ষ্য করলাম তাঁর চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হওয়ার পরিবর্তে বিষন্ন ও উদাস হয়ে পড়ল। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

" মিঞা! হযরত সাহেব কি অবগত আছেন যে আমরা এখানে কোন কোন্ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, বিরোধীতা কত প্রবল? এমন পরিস্থিতিতে যদি এই ইশতেহার প্রচার করা হয় তবে প্রথমত বারুদে অগ্নিসংযোগ করার নামান্তর হবে, জলসার আয়োজন করাও যদি অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে বিস্ময়ের কিছু নেই। অকুস্থলের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এবং পরিস্থিতি বিবেচনায় আমার উপরও কিছু দায়িত্ব বর্তায়। বেশ, খোদা যতটুকু করার সামর্থ দান করবেন, ইনশাআল্লাহ্ তা করব।"

অবশেষে চিন্তাভাবনা, পরামর্শ, চড়াই-উতরাই পার করে দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় রাত্রির অন্ধকারে কিছু অপরিচিত স্থানে কয়েকটি ইশতেহার দেওয়ালে সেঁটে দেওয়া হয় যা থাকা না থাকা সমান ছিল। কেননা অপরিচিত স্থান ছাড়াও সেই ইশতেহারগুলি এত উঁচুতে লাগানো হয়েছিল যে প্রথমত সেগুলি কেউ দেখতেই পেত না, আর দেখতে পেলেও পড়তে পারত না।

১১) আমি শুনেছি এবং দেখেওছি যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রকৃত প্রবন্ধের অংশটুকু খাজা সাহেব কাদিয়ান থেকে সঙ্গে করে

লাহোর এনেছিলেন। তিনি সেটির অধ্যয়ন এবং কুরআনী আয়াতগুলির তিলাওয়াত অনুশীলন অব্যাহত রাখেন। তাঁর লাহোর চলে যাওয়ার পর প্রবন্ধের যে যে অংশ প্রস্তুত হতে থেকেছে, তার কপি তাঁকে লাহোরে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ২৫ শে ডিসেম্বর বিকেল পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে বা ২৬ শে ডিসেম্বর রাত পর্যন্ত।

১২) খোদার কৃপায় জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তম স্থান ও ব্যবস্থাপনার অধীনে এবং ঘোর বিরোধীতার ঝড় ও ভয়াবহ বাধা-বিপত্তি জয় করে জলসা হল। বিভিন্ন প্রকার হীন ষড়যন্ত্র রচিত হল, কিন্তু অবশেষে হিন্দু, ইহুদী এবং তাদের সাহায্যকারীদের অভেদ্য দূর্গ ধরাশায়ী হল। আর ঐশী ইলহাম-'আল্লাহু আকবার খারাবাত খায়বার' এ যেরূপ বর্ণিত হয়েছিল, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তা পূর্ণতা লাভ করল। শত্রুরা টাউন হল নিতে বাধা দিলে আল্লহ্ তা'লা তার থেকেও উন্নত উপকরণ সৃষ্টি করলেন। ইসলামিয়া হাইস্কুলের অভ্যন্তরভাগের সিংহদ্বারযুক্ত প্রশস্ত দ্বিতল বিশিষ্ট ইমারত, বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, বিশালাকারের সভাগৃহ এবং গ্যালারী যুক্ত এক সুবিশাল অট্টালিকা খোদা তা'লা দান করলেন, যা এরূপ বিরাট সমাবেশের জন্য যথেষ্ট ও যথোপযুক্ত ছিল। ২৬ শে ডিসেম্বর জলসার প্রথম দিন ছিল। জলসার শ্রোতা-সংখ্যা উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রবন্ধের জন্য ২৭ শে ডিসেম্বর দেড়টায় সময় নির্ধারিত ছিল। খোদার মহিমা ও তাঁর বিশেষ কৃপার পরিণামে হযরত মৌলানা আব্দুল করীম সাহেব ভালবাসার টানে ব্যকুল হয়ে এক অদম্য উৎসাহ নিয়ে সময়ের পূর্বেই লাহোর পৌঁছে যান। যাঁর আগমণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য বিশেষ প্রশান্তি ও আনন্দের উপকরণ এনে দেন।

১৩) প্রতিকূল পরিস্থিতি, প্রবল বিরোধীতা এবং বিভিন্ন প্রকারের জটিলতার পাশাপাশি সময়ের অনপুযুক্ততার কারণে বিপদ ছিল। এবং এমন উদ্বেগও দেখা দিয়েছিল যে, জলসা হয়তো আশানুরূপ শোভাময় হয়ে উঠবে না। কিন্তু খোদার অপার মহিমা! মানুষ এমনভাবে আকৃষ্ট হয়ে আসছিল যেন ফিরিশতাদের সেনা তাদেরকে ঠেলে নিয়ে আসছে আর তাদের আহ্বানের এমন প্রভাব পড়ল যে, মানুষের মন বদলে গেল। তাদের মন বিদ্বেষ ও ঘৃণার পরিবর্তে ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে উঠল। বিরোধীদের বিরোধীতা উর্বরকের কাজ করল। বাধাসৃষ্টিকারী এবং অনিষ্টসাধনকারীদের উপদ্রব মানুষের মনোযোগ জলসার দিকে ফিরিয়ে দিল। যার ফলে মানুষ ধীরে ধীরে জলসা প্রাঙ্গণের দিকে অগ্রসর হল। এবং ক্রমেই পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, প্রাঙ্গণ , পার্শ্ববর্তী কক্ষগুলি ও সভাগৃহগুলি উপচে পড়ে। উপরের গ্যালারিগুলিতে তিলার্ধ স্থান ছিল না। এমন জনপ্লাবন ছিল যে আরও জায়গা তৈরী করতে তারই মাঝে ঠাসাঠাসি করে থাকতে হয়। ডিসম্বরের ছুটির কারণে যত্রতত্র জলসা, সম্মেলন ও বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। মানুষ যখন জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন ও স্বার্থ অর্জনে চেষ্টারত ছিল, ঠিক সেই সময় একটি খাঁটি ধর্মীয় জলসা ও সম্মেলনে এমন বিশাল জনপ্লাবনের দৃশ্য দেখে যে কেউই প্রভাবিত হয়। মানুষ সফলভাবে এমন বিশাল জনসমাবেশকে অসাধারণ, অদ্ভুৎ, ঐশী প্রেরণা ও নিদর্শনের পরিণাম বলতে বাধ্য ছিল। হিন্দু, শিখ কিম্বা আর্যসমাজী-কেউই একথা অস্বীকার করে নি। মুসলমানেরাও একথা অকপটে স্বীকার করেছে, এমনকি ইহুদী, খৃষ্টান ও দিব্যসমাজীরাও। মোটকথা প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ আজকের অলৌকিক প্রেরণা ও অনন্য আকর্ষণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, সত্যিই তাদের হৃদয়গুলি শ্রদ্ধায় বিনত হয়ে পড়েছিল। শোনা এবং প্রত্যক্ষ করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই অনুষ্ঠানের চিত্র কথায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে সেই সমাবেশ নিঃসন্দেহে পরিবেশগত দিক দিয়ে অসাধারণ, অতুলনীয় ও আযীমুশশান ছিল।

১৪) প্রবন্ধ পাঠ আরম্ভ হওয়ার উপক্রম হচ্ছে, আর শ্রোতাদের আনন্দ যেন ধরে না, তাদের মুখে সুবহানাল্লাহ্, সুবহানাল্লাহ্ উচ্চারিত হচ্ছিল। শুনেছিলাম যে সম্মোহন বিদ্যা দিয়ে সাধারণ একজন মানুষকে এমনটি করা যেতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন চিন্তাধারা ও মতবাদের হাজার হাজার মানুষের এমনভাবে মোহাচ্ছন্ন হওয়ার ঘটনা নিঃসন্দেহে অলৌকিক প্রভাবের পরিণাম ছিল। একথা সঠিক যে মৌলানা আব্দুল করীম সাহেবের কুরআনের প্রতি ভালবাসা ছিল পাগলপারা। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে দাউদ (আ.)-এর মত সুললিত কণ্ঠের আভাসও দান করেছিলেন। এছাড়াও তিনি এই আয়াতসমূহ ও প্রবন্ধের তাৎপর্য ও গ্রন্থনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অন্তরের যে বেদনা, বিগলন ও উদ্দীপনা নিয়ে তিলাওয়াত করতেন, যেভাবে তিনি প্রবন্ধ পাঠ করতেন, তা তাঁর আন্তরিক উচ্ছ্বাস ও তৃপ্তিবোধের সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে তুলত। কিন্তু এই সম্মেলনের চিত্রটিই ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, কুরআন আয়াত হোক বা সেগুলির ব্যাখ্যা, সমগ্র প্রবন্ধটিই এমন বাগ্মী ও সাবলীল ছিল যে মৌলানা সাহেবের উপস্থাপনা ভঙ্গি কিম্বা তাঁর উদ্দীপনা -কোনওটিই স্তিমিত হয় নি। তত্ত্বজ্ঞানের অনর্গল ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভাষার স্বচ্ছন্দগতি। প্রবন্ধের সৌন্দর্য ও কৌলিন্য শ্রোতাদের মোহাচ্ছন্ন করে তোলে। আমি নিজের কানে শুনেছি, হিন্দু,শিখ, কট্টর আর্যসমাজি এমনকি খৃষ্টান ভাইয়েরাই অবলীলায় সুবহানাল্লাহ্ সুবহানাল্লাহ্ উচ্চারণ করছিল।

হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ এমন নিশ্চল ও নিস্তরঙ্গ বসে ছিল, যেন কোনও নিষ্প্রাণ পুতুল। তাদের মাথার উপর পাখি বসে পড়লেও বিস্মিত হতাম না। প্রবন্ধের আধ্যাত্মিক প্রভাব হৃদয়কে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে চতুর্দিকে গভীর নিঃশব্দতার মাঝে কেবল বক্তার ভাষণের কণ্ঠটুকুই ভেসে আসছিল। খোদার কি অপার মহিমা! জীবজন্তুরা পর্যন্ত সেই সময় নীরবতা পালন করছিল। প্রবন্ধের আকর্ষণ ও প্রভাবকে বাইরের কোনও শব্দ নষ্ট হতে দিচ্ছিল না। কমবেশি দুই ঘন্টা এমন পরিস্থিতিই বিরাজ করে।

এই পরিস্থিতি ও পরিবেশটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ফুটিয়ে তুলতে না পারায় আমার আক্ষেপ হয়। যা কিছু আমি সেখানে দেখেছি ও শুনেছি তার দশ শতাংশও যদি আমার বর্ণনায় ফুটিয়ে তুলতে পারতাম! যার দ্বারা এই জ্ঞানগর্ভ নিদর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব জগতের সামনে প্রকাশিত হয়ে খোদার সৃষ্টি সত্যের বাণী শোনার প্রতি মনোযোগী হত আর এবং তাদের হৃদয় গ্রহণ করতে প্রস্তুত হত! যার ফলে সমগ্র জগতের পাপ ও উদাসীনতা দূরীভুত হয়ে হাজার হাজার মানুষ সত্য গ্রহণের তৌফিক পেত!

১৫) বেলা সাড়ে তিনটে গড়িয়ে গেল। সময় শেষ হল যার কারণে কয়েক মিনিটের জন্য এই আনন্দ ও তৃপ্তিঘন পরিস্থিতিতে ব্যাঘাত ঘটল। পরের আধ ঘন্টা মৌলবী মুবারক আলি সাহেব সিয়ালকুটি সাহেবের প্রবন্ধের জন্য নির্ধারিত ছিল। তিনি দ্রুত দাঁড়িয়ে জনগণের এই দাবি- 'এই প্রবন্ধই অব্যাহত থাকুক, অন্য কারো প্রবন্ধের পরিবর্তে এটিকে শেষ করার জন্য অতিরিক্ত সময় দেওয়া হোক'- অনুধাবন করতে পেরে নিজের সময়টুকু দিয়ে পূরণ করে দেন। এমনকি তিনি এও ঘোষণা করেন যে, আমি নিজের আকাঙ্খা ও সময় এই মূল্যবান প্রবন্ধের নামে উৎসর্গ করলাম। অতঃপর সেই মনোরম, প্রণয়োদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আরম্ভ হল আর সেই একই সম্মোহন সভাকে বেঁধে ফেলল। বেলা চারটে পার হল, কিন্তু প্রবন্ধ এখনও অসম্পূর্ণ ছিল। মানুষের জানার আগ্রহ বিন্দুমাত্র হ্রাস পেল না, বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকল। শ্রোতাদের পীড়াপীড়ি ও সংগঠকদের আগ্রহের কারণে প্রবন্ধ পাঠ অব্যাহত থাকে, এমনকি সাড়ে পাঁচটা বাজল। রাত্রির অন্ধকার ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকল। নিতান্ত বাধ্য হয়েই এই আনন্দদায়ক ও তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ সমধুর বৈঠকের সমাপ্তি হল আর প্রবন্ধের বাকি অংশ ২৯ ডিসেম্বরের জন্য স্থগিত রাখা হল।

এমন কোনও হৃদয় ছিল না যা এই আনন্দ উপলব্ধি করে নি, এমন ব্যক্তি ছিল না যে এর সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করছিল না। সকলেই প্রবন্ধের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। ভাবভঙ্গিতে হোক বা মৌখিকভাবে হোক, প্রত্যেকেই একথা স্বীকার করছিল যে, এই প্রবন্ধ সকলের উপর জয়যুক্ত হয়েছে। উৎকর্ষতা, সূক্ষ্মধর্মীতা ও সৌন্দর্যের কারণে এই প্রবন্ধটিই জলসার শোভাবর্ধক, প্রাণকেন্দ্র ও সফলতার প্রতিভূ হয়ে উঠল। শুধু তাই নয়, আমি নিজের কানে শুনেছি আর স্বচক্ষে দেখেছি, অনেক হিন্দু ও শিখ শুভাকাঙ্খী মুসলমানদের সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে বলছিল-

'এটিই যদি কুরআনের শিক্ষা হয়, এটিই যদি ইসলাম হয় যা আজ মির্যা সাহেব বর্ণনা করেছেন, তবে আমরা আজ নয়তো কাল তা গ্রহণ করতে বাধ্য হব। আর যদি মির্যা সাহেবের দু-একটি প্রবন্ধ আরও শোনানো হয়, তবে সন্দেহ নেই ইসলামই আমাদের ধর্ম হবে।"

১৬) আজকের জলসা ২৭ ডিসেম্বর বরখাস্ত করা হল। মানুষ নিজের নিজের বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। জলসা প্রাঙ্গণের দরজার দুইপার্শ্বে দুজন ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম যারা হযরত আকদস (আ.)-এর সেই ইশতেহার বিতরণ করছিল যা হুযুর আমার হাতে বিশেষ তাকিদপূর্ণ নির্দেশ সহকারে পাঠানোর সময় বলেছিলেন, 'এগুলিকে প্রকাশ্য স্থানে সেঁটে দিতে হবে, আর জলসার পূর্বেই ব্যাপকহারে প্রচার করতে হবে। তিনি এই নির্দেশও দিয়েছিলেন যে, এগুলি সংখ্যায় কম আছে, প্রয়োজন অনুসারে লাহোর থেকেই আরও ছাপিয়ে নিতে হবে, যাতে সময়ের পূর্বে প্রচারে ফলে এই ঐশী নিদর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয় আর পুণ্যাত্মারা সত্য গ্রহণের নিমিত্তে প্রস্তুত হয়। কিন্তু বাস্তবে খাজা কামালুদ্দিন সাহেবের ভয় পেয়ে যাওয়ার কারণে প্রথমে জগতবাসী ঐশী নিদর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রত্যক্ষ করল এবং এর বিজয়কে মেনে নিল, এবং পরে তাদের কাছে ইশতেহার পৌঁছল যা কয়েকদিন পূর্বে ছাপানোর পর ভালভাবে প্রচারের জন্য পাঠানো হয়েছিল। তাই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন খাজা সাহেবের এই দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা সম্পর্কে অবহিত হলেন, তিনি ভীষণ ক্রোধান্বিত হলেন, এবং বেশ কয়েক দিন পর্যন্ত যখনই এই ঐশী নিদর্শনের কথা উল্লেখ করা হত বা বহির্জগত থেকে এর সফলতার বিষয়ে সংবাদ আসত, তিনি খাজা সাহেবের এই দুর্বলতার জন্য আক্ষেপ করতেন।

প্রবন্ধের জনপ্রিয়তা ও জনগণের পীড়াপীড়ি ও দাবির কাছে নতি স্বীকার করে প্রবন্ধক কমিটির বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, হযরত মির্যা সাহেবের প্রবন্ধ শেষ করার জন্য বৈঠকে নিজেদের অনুষ্ঠানসূচিতে ২৯ শে ডিসম্বরকে ৪র্থ দিন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হল।

হুযুরের প্রবন্ধের অসামান্য জনপ্রিয়তা বিজনদের কবেই বা সহ্য হয়েছিল? মৌলবী মহম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেব সময় বৃদ্ধির গুরুত্বকে খাটো করার চেষ্টায় নিজের জন্য সময় বাড়ানোর বাসনা ব্যক্ত করেন। অতএব, আধ ঘন্টা তাঁর জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হল, কিন্তু দ্বিতীয় দিন তিনি নিজেই উপস্থিত হলেন না, বরং নিজের সময়টুকু মহম্মদ হোসেন সাহেব বাটালবীকে দিয়ে দিলেন, যার কারণ স্পষ্টই ছিল। কিন্তু খোদার কি মহিমা! শ্রোতা সংখ্যা এমনই হতাশাব্যঞ্জক ছিল যে, জলসাগাহ পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষাতেই সময় কেটে গেল, সভা কালকের ন্যায় শোভাময়ও হল না আর মৌলবী সাহেবও মঞ্চে উঠলেন না। অবশেষে অনেক অপেক্ষা সত্ত্বেও যখন সেই বাসনা পূর্ণ হওয়ার আশা দেখা দিল না, তখন অনিচ্ছা নিয়ে নিতান্ত বাধ্য হয়েই উঠে দাঁড়ালেন। আর তিনি যা কিছু লিখে এনেছিলেন তা পড়ে ফেললেন। অধিক সময় নেওয়া সত্ত্বেও নিজেও প্রসন্ন ছিলেন না, শ্রোতারাও কোনও অভিবাদন জানালো না।

১৭) ২৯ শে ডিসেম্বর প্রাত সাড়ে নটায় জলসার অনুষ্ঠান আরম্ভ হতে চলেছে। ডিসেম্বরের শেষভাগ, শীতের তীব্রতা ও আর প্রায় কাকভোর হওয়ার কারণে মানুষ হয়তো ঠিকমত প্রাত্যাহিক কর্মটিই সেরে উঠতে পারেন নি। এত ভোরে সচরাচর শহরের মানুষও ঘুম থেকে ওঠতে অভ্যস্ত নয়। তাই আশঙ্কা ছিল, খুব কম সংখ্যক মানুষই হয়তো সভায় আসবেন। আর আজ হয়তো প্রবন্ধ তেমন উপভোগ্য হবে না। কিন্তু খোদার কাজ নিজের মধ্যে এক অসামান্য আকর্ষণ শক্তি রাখে, যাকে কোনও শক্তিই প্রতিহত করতে পারে না। মানুষ যদি উদাসীনতা ও অলসতা প্রদর্শন করে, তিনি ফিরিশতাদের দিয়ে কাজ নেন। সকাল সকাল কাঁপতে কাঁপতে ঠান্ডায় জড়সড় হয়ে এত বিপুল সংখ্যক মানুষ দলে দলে পদব্রজে এসে উপস্থিত হল যে ২৭ শে ডিসেম্বর-এর দুপুরের পরের দৃশ্যও ম্লান হয়ে গেল। আর জলসা স্বমহিমায় ও পূর্ণ বৈভবে অব্যাহত থাকল। অতঃপর তা ব্যাপক সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন হল। এইরূপে হুযুর (আ.)-এর রচনা সমগ্র জগতের উপর নিজের প্রভাব, সৌন্দর্য, সফলতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্যবাদিতার মোহর লাগিয়ে জ্ঞানের জগতের জন্য এক অক্ষয় নিদর্শন হয়ে ধর্মের আকাশে চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে থাকল। শুধু মিত্র কেন, শত্রুরাও এর প্রশংসা না করে পারে নি। আপন পর থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, ব্যবস্থাপক-মোটকথা প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এই প্রবন্ধ নিয়েই আলোচনা চলছিল। পত্রপত্রিকাগুলি প্রতিবেদন ছেপে এই সত্যতার স্বীকারুক্তি জানাল। ব্যবস্থাপক কমিটির নিজের পক্ষ থেকে এই স্বীকারুক্তিকে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টে ছাপিয়ে সত্য জ্ঞাপন করে।

'সত্য, আকাশের চাঁদ লুকিয়ে থাকতে পারে না'। আর একথা অস্বীকার করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা পূর্বাহ্নেই স্বীয় প্রিয়ভাজন সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে যা কিছু জানিয়ে রেখেছিলেন তা পূর্ণ হয়। খোদার কথা পূর্ণ হল আর জগতের কোন শক্তি, পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র খোদার বাণী পূর্ণ হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি।

১৮) সর্বধর্ম সম্মেলনের রিপোর্ট প্রকাশিত হল আর ব্যবস্থাপক কমিটির সদস্যদের পক্ষ থেকে এর ব্যয়ভার বহন করা হল, যে কমিটিতে প্রত্যেক জাতি ও ধর্মের সদস্য এবং উচ্চবর্ণের কর্তারা ছিলেন। জলসায় যে সমস্ত রচনা পঠিত হয়েছিল বা জলসার জন্য রচিত হয়েছিল, রিপোর্টে সেগুলির প্রত্যেকটি অবিকলভাবে লিপিবদ্ধ হল, যাতে বিশ্ব এই ধর্মীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে একত্রিত দেখে বিবেচনা সহকারে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মীমাংসা করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব, ইসলামের সত্যতা, মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্যতা এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা তাঁর প্রকৃত রসূল ও নবী হওয়ার জলজ্যন্ত প্রমাণ।

হুযুরের এই রচনাটিই উর্দুতে 'ইসলামী ওসূল কি ফিলাসফী' নামে হাজার লক্ষ লক্ষ হারে প্রকাশিত হয়ে সারা জগতের আধ্যাত্মিক আনন্দ ও হিদায়তের পথ মসৃণ করেছে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর আরও অনেক ভাষাতেও প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

১৯)এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে আর খোদা সাক্ষী আছেন যে হাজার হাজার মানুষ জলসায় যা কিছু দেখেছিল ও শুনেছিল, ঠিক সেগুলিই রিপোর্টে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা যে রচনাগুলি লিখেছিল, জলসায় পাঠ করেছিল এবং তা শেষে ব্যবস্থাপক কমিটির হাতে তুলে দিয়েছিল, সেগুলি অবিকল ঠিক তেমনভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবীর বুদ্ধির কথা আর কি বলব? তিনি রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার এই বলে গণ্ডগোল বাঁধান যে তার নামে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে, সেটি আদৌ তার নয়।

এই অভিযোগের মূলে মৌলবী সাহেবের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজের পরাজয়ের গ্লানি ও ব্যর্থতা লুকোনোর অপচেষ্টা। যদিও তার এই মন্তব্য নিজেকেই অপদস্থ করার নামান্তর ছিল, যা ব্যবস্থাপকদের নিকট গোপন ছিল না। তাই ব্যবস্থাপগণ মৌলবী সাহেবের এই হইহট্টগোলকে বিবেচনাযোগ্য বলেই মনে করলেন না। এইভাবে মৌলবী সাহেবের সম্মান রক্ষার পরিবর্তে আরও বেশি সম্মানহানি হল। যার ফলে মৌলবী সাহেব তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন এবং এই গভীর অপমান তার পক্ষে হজম হওয়া সম্ভব ছিল না। কেননা মানবীয় পরিকল্পনা এটিকে ঠিক করতে পারত না। অন্যথায় তিনি যে অভিযোগ করছিলেন, যদি তা সত্যিই হত, তবে তিনি কেন আসল প্রবন্ধ প্রকাশ করে ব্যবস্থাপকদের এই মিথ্যাচারকে খান খান করে দেখালেন না?

২০) সোয়ামী শোগন চন্দ্র সাহেব, যার দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা সত্যের এই মহান নিদর্শন প্রকাশের উপকরণ সৃষ্টি করেছিলেন, জলসার সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের সময় এবং রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত তাঁকে ইতস্তত দেখা গেলেও, হঠাৎ তিনি কোথায় যেন উধাও হয়ে গেলেন, কেউ তার সন্ধান দিতে পারল না। খোদার কুদরত যেন তাকে এই কাজের উদ্দেশ্যেই কাদিয়ানে এনে ফেলেছিল, অতঃপর পূর্বের ন্যায়ে তাকে অদৃশ্য করে দিল।

নোট: হযরত মুনশী জালালুদ্দীন সাহেব বিলানবী এবং হযরত পীরজী সিরাজুল হক সাহেব নুমানি রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম উভয় বুজুর্গের হাতের অনুলিপিতে হযরত আকদস (আ.) -এর সেই রচনা যা থেকে হযরত আব্দুল করীম সাহেব জলসায় পড়ে শুনিয়েছিলেন, তা আজও আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। কিন্তু যেহেতু আমি এই পবিত্র ও মূল্যবান আমানতকে যথাযথভাবে রক্ষা করতে অপারগ। অতএব এটিকে জাতির আমানত মনে করে সৈয়্যাদানা কমরুল আম্বিয়া মির্যা বশীর আহমদ এম.এ সাহেব সাল্লামাহু রাব্বাহু-র হাতে সোপর্দ করছি, যিনি এমন কাজের সব থেকে বেশি যোগ্যতা এবং অধিকার রাখেন, যাতে তিনি সেটিকে পরবর্তীকালে জাতীয় সংগ্রহালয়ে রেখে ভবিষ্যত প্রজন্মের ঈমান ও বিশ্বাসে দৃঢ়তা দানের এবং ঐশীজ্ঞানে উন্নতি সাধনের মাধ্যম বানাতে পারেন।

ইতি

আব্দুর রহমান কাদিয়ানী

****

“পবিত্র যুদ্ধ”

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বনাম ডেপুটি আব্দুল্লাহ্ আথাম ঐতিহাসিক মোবাহাসা

১৮৯৩ সালের ২২ শে থেকে ৫ ই জুন পর্যন্ত অমৃতসরে খৃষ্টান ও মুসলমান পক্ষের মাঝে একটি মোনাযারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যে মোনাযারায় সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলামের পক্ষ থেকে ছিলেন এবং খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে ছিলেন ডেপুটি আব্দুল্লাহ্ আথম।এই মোনাযারাটি ‘জঙ্গে মুকাদ্দস’ বা পবিত্র যুদ্ধ নামে কাদিয়ানের জিয়াউল ইসলাম প্রেস থেকে হাজী হাফিয হাকীম ফযল দ্বীন সাহেবের তত্তাবধানে ১৯০৪ সালের ২০ শে অক্টোবর প্রকাশিত হয়েছিল। রূহানী খাযায়েনের ৬ষ্ঠ খণ্ড দ্রষ্টব্য। হযরত জালালুদ্দীন শামস সাহেব পুস্তকের যে পরিচিতি বর্ণনা করেছেন, এখানে সেটিই তুলে ধরা হল।

‘জঙ্গে মুকাদ্দস’ বা ‘পবিত্র যুদ্ধ’ সেই মহান মোবাহাসার পূর্ণ ধারাবিবরণীর নাম যা অমৃতসরে ১৮৯৩ সালের ২২ শে মে থেকে ৫জুন ইসলাম ও খৃষ্টবাদের মাঝে হয়েছিল। ইসলামের পক্ষ থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে ডেপুটি আব্দুল্লাহ্ আথাম প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

মোবাহাসার কারণ সমূহ: রূহানী খাযায়েনের ১ম ও ৩য় খণ্ডে আমি পাঞ্জাব ও সমগ্র ভারতে খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছি। সেখানে একথাও লিখেছি যে, বর্তমানে খৃষ্টবাদের প্রচার পরম উৎকর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। গ্রাম-গঞ্জ ও শহরে তাদের মিশন প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতীয় মুসলমান এবং অন্যান্য জাতির মানুষেরা দলে দলে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছিল। এমনকি এই ধারণা করা হয় যে কয়েক বছরের মধ্যেই ভারত খৃষ্টবাদের বাহুপাশে আবদ্ধ হবে। ১৮৮৮ সালে পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নর চার্লিস এচিসন শিমলায় অনুষ্ঠিত মিশনারীদের এক বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন-

‘যে গতিতে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার চেয়ে চার পাঁচ গুণ অধিক হারে এদেশে খৃষ্টবাদ প্রসারিত হচ্ছে। এই মুহূর্তে ভারতীয় খৃষ্টানদের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষে পৌঁছে গেছে। ”

(দি মিশনার, রেভারেন্ড রবার্ট ক্লার্ক)

টিকা: রেভারেন্ড রবার্ট ক্লার্ক দি তাঁর রচিত মিশনার অফ দি সি.এম.সি ইন পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ পুস্তকে (সি.এম.সি লন্ডন, প্রকাশকাল: ১৯০৪) এই মোবাহাসাকে The graet controversy অর্থাৎ এক মহান বিতর্ক নামে অভিহিত করেছেন আর এই মোবাহাসাকে পবিত্র যুদ্ধ নাম দিয়েছিলেন স্বয়ং ডক্টর হেনরি মার্টিন ক্লার্ক।

টিকা: আব্দুল্লাহ্ আথাম ১৮৩৮ সালের কাছাকাছি সময় আম্বালায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৩ সালে তিনি করাচিতে ব্যাপ্টিজম গ্রহণ করেন। সেই সময়ই তিনি নিজের নামের সঙ্গে ‘আসিম’ অর্থাৎ পাপী শব্দ যুক্ত করেন। প্রথমে আম্বালা, তারণতারণ এবং বাটালায় তহসীলদার পদে আসীন ছিলেন। পরে সিয়ালকোট, আম্বালা এবং কর্ণালে এ.ই.সি-এ পদে ছিলেন। অতঃপর অবসর গ্রহণের পর তিনি অমৃতসর মিশনের জন্য নিজেকে উৎসর্গিত করেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন।

১৮৫১ সালের পূর্বে ভারতীয় খৃষ্টানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯১০৯২জন। সেখানে ১৮৮১ সালে সেই সংখ্যা ছিল ৪১৭৩৭২জন। যে যুগে এই মোবাহাসা হয়েছিল সে সময় খৃষ্টান আহ্বায়ক, ভারতীয় ও ইউরোপীয় প্রচারকগণ পাঞ্জাবের অসংখ্য স্থানে মানুষকে খৃষ্টধর্মের প্রতি আহ্বান করছিল। দাজ্জাল পূর্ণশক্তিতে ইসলাম ধর্মকে ধ্বংস করতে তৎপর হয়েছিল, অপরদিকে ইসলামের উলেমারা নিদ্রাযাপন করছিল। ১৭৯৯ সালে চার্চ মিশনারী সোসাইটি ভারতে সর্বপ্রথম প্রচার কার্য শুরু করেছিল। কিন্তু সেই সময় একাধিক মিশনারী সোসাইটি কাজ করছিল, যাদের প্রধান কার্যালয়গুলি ছিল ইংল্যান্ড, জার্মানী ও আমেরিকার মত দেশগুলিতে। ১৯০১ সালে এই মিশনারী সোসাইটির সংখ্যা ছিল ৩৭টি। এছাড়াও অনেক মিশনারী এমনও ছিলেন যারা এই সব সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। মধ্য-এশিয়ায় খৃষ্টধর্মের প্রচারের জন্য তারা পাঞ্জাবকে স্বাভাবিক ঘাঁটি হিসেবে মনে করত। পাঞ্জাবের যে তেরোটি বিখ্যাত শহরে তাদের বড় বড় মিশন প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেগুলির মধ্যে অমৃতসর অন্যতম। ১৮৫২ সালে এটি মিশনারী চার্চ স্থাপন করেছিল। অমৃতরসরের জান্ডিয়ালা জেলায় ১৮৫৪ সালে খৃষ্টান মিশনের গোড়াপত্তন হয়। কিন্তু ডক্টর হেনরী মার্টিন ক্লার্ক যখন এম.ডি.সি এম. (এডেনবেরা) অমৃতসর জেলার মেডিক্যাল মিশনারী ইনচায ছিলেন, তখন তিনি এম.আর এ. এস.সি.এম.এস১৮৮২ সালে অমৃতসর মেডিক্যাল মিশনের একটি শাখা জান্ডিয়ালাতেও স্থাপন করেন, পরবর্তীতে যা খৃষ্টবাদের প্রসারের নতুন দিগন্ত সাব্যস্ত হয়। খৃষ্টান প্রচারকগণ যত্রতত্র উপদেশমূলক সভা করত। জান্ডিয়ালার মুসলমানদের মধ্যে মিঞা মহম্মদ বখশ নামে জনৈক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি সামান্য জ্ঞান নিয়েই তাদের মোকাবেলার জন্য দাঁড়িয়ে পড়েন। তিনি আরও অনেক মুসলমান ভাইয়েদেরকেও খৃষ্টান প্রচারকদেরকে প্রশ্ন করতে শিখিয়ে দেন। এখন জান্ডিয়ালর মুসলমান এবং খৃষ্টান-আহ্বয়াকদের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। অবশেষে জান্ডিয়ালার খৃষ্টানরা ডাক্টর মার্টিন ক্লার্কের কাছে পরিস্থিতির বিবরণ দিলে তিনি জান্ডিয়ালার খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে মিঞা মহম্মদ বখশ সাহেবকে সম্বোধন করে জান্ডিয়ালার মুসলমানদের নামে একটি পত্র লেখেন। এই পত্রে ডাক্টার ক্লার্ক জান্ডিয়ালার খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে লেখেন-

“আপনি নিজে কিম্বা আপনার ধর্মের অনুসারীরা পরামর্শ করে একটি সময় নির্ধারণ করুন। আর যে বিদ্বান ব্যক্তির উপর আপনারা আস্থা রাখতে পারেন তাকে আহ্বান করুন। আমরাও নির্দিষ্ট সময়ে সভায় আমাদের নিজের পছন্দের কাউকে উপস্থাপন করব। যাতে বৈঠক এবং উপস্থাপিত বিষয়াদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।”

তিনি একথাও লেখেন: যদি ইসলামের পক্ষের বন্ধুরা এমন মোবাহাসায় অংশগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হন, তবে ভবিষ্যতে ধর্মীয় আলোচনার বিষয়ে নিজের মুখ বন্ধ রাখবেন আর প্রচারকার্য ও অন্যান্য সময় ভিত্তিহীন যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকবেন।

(হুজ্জাতুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৬০)

মিঞা মহম্মদ বখশ সাহেব ১৮৯৩ সালের ১১ই এপ্রিল এই চিঠিটি পেয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে লেখা নিজের চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দেন এবং হুযুরের কাছে আবেদন করে লেখেন-

‘জান্ডিয়ালার মুসলমানরা অধিকাংশই দুর্বল ও অভাবগ্রস্থ।

যুগ খলীফার বাণী

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সংগ্রাম না করে, দোয়া না করে, সে অন্তরকে ঘিরে রাখা অজ্ঞতার জমাট অন্ধকারকে দূর করতে পারে না। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

(বেলজিয়াম জলসার সমাপনী ভাষণ, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)

অতএব, হুযুরের নিকট জান্ডিয়ালাবাসীকে সাহায্য করার আবেদন করছি। অন্যথায় মুসলমানদের উপর কলঙ্কের দাগ লেগে যাবে।"

(হুজ্জাতুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫৯)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) চিঠিটি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি মিঞা মহম্মদ বখশ সাহেবকে এর যথাযথ উত্তর দেওয়ার পর ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের ডক্টর ক্লার্ক এর মাধ্যমে জান্ডিয়ালার খৃষ্টানদের নামে একটি চিঠি পাঠান। যাতে তিনি পূর্বোক্ত মিঞা মহম্মদ বখশ সাহেবের নামে লেখা চিঠিতে মোবাহাসার আমন্ত্রণের উল্লেখ করে লেখেন-

" জান্ডিয়ালার মুসলমানদের আমার থেকে বেশি অধিকার নেই, অধিকন্তু যে পরিস্থিতিতে দয়ালু ও কৃপালু খোদা তা'লা এই অধমকে এই সব কাজের জন্য প্রেরণ করেছেন, সেক্ষেত্রে এমন সময় নীরব থাকা ঘোর পাপের কাজ হবে। অতএব আমি আপনাদেরকে অবগত করছি যে এই কাজের জন্য আমিই উপস্থিত আছি।"

(হুজ্জাতুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৬১)

তিনি আরও লেখেন-

এই বিতর্ক সভা হবে জীবিত কিম্বা মৃত ধর্ম নিরুপণের লক্ষ্যে। ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ যে সকল আধ্যাত্মিক বৈশিষ্টাবলীর উল্লেখ করেছে, সেগুলি আজ অবধি বিদ্যমান কি না, একথাও বিবেচিত হবে। "

(হুজ্জাতুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৬৩-৬৪)

আর এর প্রমাণ এভাবে উপস্থাপিত হবে-

"একজন সর্বগুণসম্পন্ন মুসলমান হওয়ার জন্য কুরআন করীমে বিদ্যমান শিক্ষা ও উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য অনুসারে মুসলমানদের পক্ষ থেকে একজন নিজেকে প্রমাণ করুক। আর যদি এমনটি করতে না পারে, তবে সে মুসলমান নয়, মিথ্যাবদী। অনুরূপভাবে খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে কোনও এক ব্যক্তি ইঞ্জিলে বর্ণিত শিক্ষা ও বৈশিষ্ট অনুযায়ী নিজেকে খৃষ্টান প্রমাণ করুক। যদি না সে প্রমাণ করতে পারে, তবে সে খৃষ্টান নয়, মিথ্যাবাদী।"

(হুজ্জাতুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৬, পৃ: ৬২)

এর উত্তরে ১৮৯৩ সালের ১৮ই এপ্রিল জান্ডিয়ালার খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে ডক্টর ক্লার্ক লেখেন-

"আমাদের দাবী আপনার কাছে নয়, জান্ডিয়ালার মহম্মদীয়দের কাছে। আমরা আপনার আহ্বান স্বীকারে অপারগ। তাদেরকে আমরা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি, যার উত্তরের জন্য প্রতীক্ষায় রয়েছি। ...তারা যদি আপনাকে স্বীকার করে এই পবিত্র যুদ্ধের জন্য নিজেদের পক্ষ থেকে উপস্থাপন করে, তবে এতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই, বরং আনন্দিতই হব।"

(হুজ্জাতুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৬, পৃ: ৬৪)

২৩শে এপ্রিল এই চিঠির উত্তর দিতে গিয়ে পাদ্রী সাহেবকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লেখেন- " আমি আমার কয়েকজন প্রিয় বন্ধুকে দূত হিসেবে আপনাদের নিকট প্রেরণ করছি। আশা করি আপনারা এই পবিত্র যুদ্ধের জন্য আমাকে মোকাবেলার জন্য অনুমোদন করবেন। জান্ডিয়ালার কিছু মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আপনার লেখা চিঠি আমি পেলাম এবং যখন একথা লেখা দেখলাম যে, 'কেউ আমাদের মোকাবালা করুক', তখন আমার অন্তর বলে উঠল, 'আমি আছি যার হাতে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন এবং সত্যকে প্রকাশ করে দিবেন। যে সত্য আমি প্রাপ্ত হয়েছি, যে সূর্য আমার মধ্যে উদিত হয়েছে, তা গোপন থাকতে চায় না। আমি দেখতে পাচ্ছি সেগুলি এখন শক্তিশালী কিরণসহকারে আত্মপ্রকাশ করবে আর অন্তরসমূহে নিজের হাত প্রবিষ্ট করবেন এবং নিজের দিকে টেনে আনবেন।

অত্ঃপর তিনি বলেন:

"আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, জান্ডিয়ালায় কোনও বিখ্যাত ও নামকরা ফাযিল নেই। আর সাধারণ মানুষের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া আপনার মর্যাদার পরিপন্থীও বটে। আর এই অধম সম্পর্কে আপনাদের কিছুই অজানা নেই যে কিভাবে বিগত দশ বছর থেকে আপনাদের মোকাবেলার জন্য যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার জ্ঞানে জান্ডিয়ালায় একজন ব্যক্তিও এমন নেই যাকে এই ময়দানের সাধারণ সৈন্য হিসেবেও ধরা যেতে পারে।"

(হুজ্জাতুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৬, পৃ: ৬৫)

তিনি (আ.) একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে,

এই বিতর্ক কেবল ধরাপৃষ্ট পর্যন্তই যেন সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং স্বর্গলোকও যেন এর সঙ্গে যুক্ত হয়। আর মোকাবেলা যেন হয় কেবল এই বিষয়টি নিয়ে যে আধ্যাত্মিক জীবন , স্বর্গীয় গ্রহণীয়তা এবং সুস্পষ্ট নীতিবোধ কোন্ ধর্মে রয়েছে। আর আমি এবং আমার প্রতিপক্ষ যেন আমাদের নিজেদের উপর নিজের নিজের (ধর্ম) গ্রন্থের প্রভাবসমূহ প্রমাণ করি।

(হুজ্জাতুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৬, পৃ: ৬৬)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বার্তাবাহক দলটি এই পত্র নিয়ে অমৃতসরে পৌঁছে ডক্টর মার্টিন ক্লার্কের সঙ্গে আলাপ করে বিতর্কের জন্য শর্তাবলী নির্ধারণ করে। এরপর ২৪ শে এপ্রির ডক্টর মার্টিন ক্লার্ক হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে লেখেন-

মুসলমানদের পক্ষ থেকে মোকাবিলা করার জন্য মহাশয়ের আহ্বানকে আমি সানন্দে গ্রহণ করছি। বার্তাবাহকগণ আপনার পক্ষ থেকে বিতর্কসভা এবং প্রয়োজনীয় শর্তাবলী নির্ধারণ করেছেন। এই শর্তগুলি আপনার কাছে স্বীকার্য কি না তা অবগত করবেন।

(হুজ্জাতুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৬, পৃ: ৬৬-৬৭)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ২৫ শে এপ্রিল পাদ্রী ডক্টর ক্লার্ককে উত্তরে লেখেন-

"আমি সেই সমস্ত শর্ত আমি স্বীকার করছি, যেগুলির উপর আমার বন্ধুদের স্বাক্ষর হয়েছে।"

(হুজ্জাতুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৬, পৃ: ৬৯)

অনুমোদন দেওয়ার সময় তিনি একথাও লেখেন যে, এই বিতর্কসভাকে উভয়ধর্মের জন্য নির্ণায়ক করে তোলার জন্য ছয় দিনের মোবাহাসার পর সপ্তম দিনে মোবাহালা হিসেবে একটি আধ্যাত্মিক মোকাবেলা করা এবং উভয়পক্ষের এর জন্য দোয়া করাও আবশ্যক।

যেমন খৃষ্টানপক্ষ দাবি করবে যে, যে ঈসা মসীহ্ নাসেরী-র উপর আমি ঈমান আনি, তিনিই খোদা আর কুরআন হল মানুষের রচনা, খোদা তা'লার কিতাব নয়। আমি যদি এই বিষয়ে সত্য না হয়, তবে এক বছরের মধ্যে আমার উপর এমন শাস্তি নেমে আসুক যা আমার লাঞ্ছনার কারণ হবে। অনুরূপভাবে এই অধমও দোয়া করবে যে, হে স্বয়ংসম্পূর্ণ মহাসম্মানীয় খোদা! আমি জানি যে, বস্তুত ঈসা মসীহ নাসেরী তোমার বান্দা ও রসূল। তিনি মোটেই খোদা নন। কুরআন করীম তোমার পবিত্রগ্রন্থ এবং মহম্মদ (সা.) তোমার প্রিয় ও সম্মানীয় রসূল। আমি যদি এ বিষয়ে সত্য না হই, তবে এক বছরের মধ্যে আমার উপর এমন শাস্তি অবতীর্ণ কর যা আমাকে লাঞ্ছিত করবে। হে খোদা! এক বছরের মধ্যে যদি তোমার পক্ষ থেকে আমার সমর্থনে এমন কোনও নিদর্শন প্রকাশিত না হয় যার মোকাবেলা করতে আমার সমস্ত বিরুদ্ধবাদী অসমর্থ হয়, তবে এটিই আমার লাঞ্ছনার জন্য যথেষ্ট হবে।"

(হুজ্জাতুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৬, পৃ: ৭০)

স্বর্গীয় নিদর্শন দেখানোর আহ্বান

এরপর তিনি (আ.) সেই ইশতেহার

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam and family, Dhantala, Jalpaiguri District

প্রকাশ করেন যার বিষয়বস্তু হল-

" পবিত্র যুদ্ধ এবং এর মোকাবেলার জন্য ডক্টর পাদ্রী ক্লার্ক-এর ইশতেহার" এই ইশতেহারে সংক্ষিপ্তভাবে মোবাহাসার জন্য নির্ধারিত শর্তাবলীর উল্লেখ ছাড়াও মোবাহাসার পর মোবাহালা এবং নিদর্শন দেখানোর আহ্বান জানানো হয়।

মোবাহালা সম্পর্কে হুযুর (আ.) বলেন: "এটি (মোবাহালা) কেবল এতটুকুই যথেষ্ট যে, উভয়পক্ষ নিজের নিজের ধর্মের সমর্থনের জন্য খোদা তা'লার নিকট স্বর্গীয় নিদর্শন প্রার্থনা করবে আর এই নিদর্শনগুলি প্রকাশের জন্য এক বছর সময়কাল নির্ধারিত হোক। অতঃপর যে পক্ষের সমর্থনে মানবীয় শক্তি-বৃত্তির উর্দ্ধে কোনও স্বর্গীয় নিদর্শন প্রকাশিত হবে, যার মোকাবেলা প্রতিপক্ষ করতে ব্যর্থ হয়, তবে বিজীত পক্ষ সেই পক্ষের ধর্ম অবলম্বন করতে বাধ্য থাকবে, যে পক্ষকে আল্লাহ্ স্বীয় স্বর্গীয় নিদর্শন সহকারে জয়যুক্ত করেছেন। আর যদি ধর্ম অবলম্বন করতে অস্বীকার করে, তবে নিজের অর্ধেক সম্পত্তি সেই সত্য ধর্মের সহায়তার উদ্দেশ্যে বিজয়ী পক্ষের হাতে তুলে দেওয়া তার জন্য অনিবার্য হবে। "

(হুজ্জাতুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৬, পৃ: ৪৮)

তিনি আরও বলেন:

" যদি এক বছরের মধ্যে দুই পক্ষের পক্ষ থেকে কোনও নিদর্শন প্রকাশিত না হয়, কিম্বা উভয় পক্ষ থেকেই প্রকাশিত হয়, তবে এই প্রকাশক এমন পরিস্থিতিতেও নিজেকে পরাজিত বলে মনে করবে এবং এমন শাস্তির যোগ্য মনে করবে যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু আমি খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট আর বিজয় লাভের সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছি, তাই যদি কোনও খৃষ্টান বন্ধু আমার মোকাবেলায় স্বর্গীয় নিদর্শন প্রদর্শন করে কিম্বা এক বছরের মধ্যে আমি দেখাতে না পারি, তবে স্পষ্ট হয়ে গেল যে আমি মিথ্যার উপর রয়েছি।.... আমার সত্যতার জন্য মোবাহালার পর এক বছরের মধ্যে আমার পক্ষ থেকে অবশ্যই নিদর্শন প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। আর যদি নিদর্শন প্রকাশিত না হয়, তবে আমি খোদার পক্ষ থেকেই নই। আর কেবল আমি সেই শাস্তিই নয় বরং মৃত্যুর শাস্তির যোগ্য। "

(হুজ্জাতুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৬, পৃ: ৪৯)

তিনি নিদর্শন প্রকাশ ও মোবাহালা সম্পর্কে মোবাহাসা চলাকালীন বার বার প্রতিপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে কেউই এই আধ্যাত্মিক প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এমনকি আব্দুল্লাহ্ আথাম নিজের এক চিঠিতে পরিস্কার লেখেন-

'আমরা এবিষয়ে মোটেই বিশ্বাসী নই যে, প্রাচীন শিক্ষামালার জন্য নুতন নিদর্শনের কোনও প্রয়োজন আছে। কাজেই নিদর্শনের জন্য আমাদের না আছে তাগিদ, না এর ক্ষমতা আমাদের আছে।

তথাপি মহাশয় যদি কোনও নিদর্শন প্রকাশে উদ্যত হন, তবে তার থেকে আমরা চোখ ফিরিয়ে নিব না, আর আপনার নিদর্শন দ্বারা যতটুকু সম্ভব -আত্মসংশোধন করে নেওয়াকে নিজেদের একান্ত কর্তব্য বিবেচনা করব।"

(হুজ্জাতুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৬, পৃ: ৫২)

হুযুর (আ.) নিদর্শন দেখার পর অবিলম্বে মুসলমান হওয়ার যে শর্ত আরোপ করেছিলেন, তা স্বীকার করে নিয়ে মিস্টার আব্দুল্লাহ্ আথম ৯ই মে তারিখের চিঠিতে লেখেন-

"যদি মহাশয় কিম্বা অন্য কোনও ব্যক্তি কোনওভাবে অর্থাৎ নিদর্শন প্রকাশ কিম্বা অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা কুরআনের শিক্ষামালাকে ঐশী শিক্ষামালা প্রমাণ করতে পারেন, তবে আমি স্বীকার করছি যে মুসলমান হয়ে যাব।"

(সাচ্চাই কা ইযহার, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৮০)

মোবাহাসার শর্তাবলী নির্ধারণ হয়েছে। জান্ডিয়ালার মুসলমানেরা নিজেদের সম্মতি জানিয়েছে, কিন্তু পাদ্রী আথাম এবং অন্যান্য পাদ্রীগণের ডক্টর ক্লার্ক দ্বারা হযরত মসীহ (আ.)-এর মোনাযারা স্বীকার করে নেওয়া পছন্দ হয় নি। তাই অমৃতসরের রিয়াজ হিন্দ প্রেসের মালিক শেখ নুর আহমদ সাহেব নিজের পত্রিকা 'নুর আহমদ'-এর ২২ পৃষ্ঠায় লেখেন-'পাদ্রীদের মধ্যে কে খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে মোনাযারার জন্য পেশ হবেন এবং যিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করছেন- একথা জ্ঞাত করার উদ্দেশ্যে তিনি এবং মিস্ত্রী কুতুবুদ্দীন সাহেব যখন পাদ্রী ইমাদুদ্দীন সাহেবের কাছে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি কি এই মোনাযারায় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন, তখন তিনি উত্তর দিলেন, আমি এমন বিতর্কসভাকে অনর্থক মনে করি। আমি কেনই বা এমনটি করতে যাব? একথা শুনে আমি তাঁকে জান্ডিয়ালার ঘটনা শোনালে তিনি বললেন, হেনরী মার্টিন ক্লার্ক হবে হয়তো।"

আর তিনি যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রতিনিধিবর্গকে সঙ্গে নিয়ে রেলওয়ে স্টেশন থেকেই ডক্টর মার্টিন ক্লার্কের গৃহে নিয়ে পৌঁছলেন, যাদেরকে তিনি (আ.) শর্তাবলী নির্ধারণের জন্য পাঠিয়েছিলেন, তখন ডক্টর ক্লার্ক সাহেব ভৃত্যকে বারান্দায় চেয়ার পাতার নির্দেশ দিয়ে নিজে অন্য দরজা দিয়ে আব্দুল্লাহ্ আথম-এর গৃহে যান, যেটি তাঁর গৃহ সংলগ্নই ছিল। এরই মধ্যে মিঞা মহম্মদ বখশ সাহেবও জান্ডিয়ালা থেকে অমৃতসর পৌঁছেছিলেন। ডক্টর ক্লার্ক আথাম সাহেবকে বলেন,

"কাদিয়ান থেকে কয়েকজন এসেছেন বিতর্কসভার জন্য শর্তাবলী, দিনক্ষণ এবং অন্যান্য বিষয় নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে। আপনি গিয়ে সব কিছু ঠিক করে নিন। আথাম সাহেব কানে হাত রেখে বললেন, ডক্টর সাহেব! যদি একশ অন্য মৌলবী হত, তবে কোনও পরোয়া ছিল না। তুমি কোথায় বোলতার চাকে ঢিল ছুড়েছো! মির্যা কাদিয়ানীর মোকাবেলা করা এবং তাকে সামলানো সহজ কাজ নয়, ভীষণ দুঃসাধ্য কাজ। তুমি নিজেই বিপদ ডেকে এনেছ। অতএব, তুমিই এর মোকাবেলা কর। আমি মোটেই যাব না, আর না অংশ গ্রহণ করব। ডক্টর সাহেব বললেন, খৃষ্টান জাতির তুমিই যোদ্ধা। তুমিই একাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পার। তোমার ভরসাতেই আমি এই কাজ আরম্ভ করেছি, এখন তুমিই কিনা বেঁকে বসছ। তোমাকে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে। পৌণে ঘন্টার পীড়াপীড়ির পর ডক্টর সাহেব আথম সাহেবকে সঙ্গে করেই নিয়ে আসলেন। এই কথোপকথনটি পরে জানা যায় আব্দুল্লাহ্ আথাম-এর পরিচারিকার কাছ থেকে। তারা দুজনে এসে চেয়ারে বসলে আথাম সাহেবের মুখ ফসকে এই কথা বেরিয়ে আসে, হায় আমি ধ্বংস হয়ে গেলাম! এরপর মোনাযারার শর্তাবলী নির্ধারণ হয়।"

(নুর আহমদ পত্রিকা, পৃ: ২৪)

অমৃতসর এবং বাটালা থেকে আসা মৌলবীরা যখন পাদ্রী আথম সাহেবকে তার বাসভবনে গিয়ে বলল, তুমি অন্য মৌলবীদের সঙ্গে বিতর্ককে মঞ্জুর কর নি কেন? মির্যা সাহেবের সঙ্গে বিতর্ক করতে কেন সম্মত হয়েছ? তাকে তো উলেমাগণ সম্মিলিতভাবে কাফির আখ্যায়িত করেছে। তখন ডক্টর ক্লার্ক সুযোগ বুঝে বললেন, 'আমি তো আগেই বলেছিলাম, মির্যা সাহেবের

শেখ নুর আহমদ সাহেবকেও হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বার্তাবাহকগণের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যিনি শর্ত নির্ধারণের জন্য হুযুরের পক্ষ থেকে অমৃতসর গিয়েছিলেন। শেখ সাহেবই ডক্টর ক্লার্ক-এর কাছে সময় নির্ধারণ করে প্রতিনিধি দলের সদস্যদেরকে স্টেশন থেকে সঙ্গে করে ডক্টর ক্লার্কে কুঠিতে নিয়ে পৌঁছেছিলেন। আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন মোবাহাসার জন্য অমৃতসরে আসেন, তখন তাঁর বাড়িতেই অবস্থান করেছিলেন। পরে হাজী মাহমুদ সাহেবের অনুরোধে তাঁর বাড়িতে আসেন, যিনি অমৃতসরের জনৈক ধনাঢ্য মরহুম খান মহম্মদ শাহ সাহেবের জামাতা ছিলেন। হুযুর (আ.) বলেন, শেখ নুর আহমদের সাাহেবের কাছে অনুমতি নিন। শেখ সাহেব হাজী মাহমুদ সাহেবকে অনুমতি দিলে হুযুর (আ.) তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন। অমৃতসরে শেখ নুর আহমদ সাহেবই এই মোনাযারা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধান করতেন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

যুগ খলীফার বাণী

জামাতের সদস্যদের উচিত তাকওয়া এবং আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি সাধন করা, এটিই জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

(স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ার-এর বিশেষ বার্তা, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

সঙ্গে বিতর্ক করা সহজ কাজ নয়, এখন ভাল সুযোগ হাতে এসেছে। মির্যা সাহেবকে উত্তর দিয়ে দিন। আর এই মৌলবীদের সঙ্গে বিতর্ক করতে হলে করুন, অসুবিধের কিছু নেই।"

(নুর আহমদ পুস্তিকা পৃ: ২৪)

পরে ডক্টর ক্লার্ক সাহেব ১২ই মে ১৮৯৩ একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন যা 'নুর আফশাঁ' পত্রিকায় পরিশিষ্ট হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই ইশতেহার প্রকাশের নেপথ্যে তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে যেন মোবাহাসা না হয়। এতদুদ্দেশ্যে তিনি জান্ডিয়ালার মুসলমানদেরকে তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলার জন্য মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবীর এবং অন্যান্য উলেমাদের পক্ষ থেকে দেওয়া সেই কুফরী ফতোয়ার উল্লেখ করেন, যা ইশায়াতুস সুন্নাহ্' পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছিল। আর উক্ত পুস্তকের কেনাকাটার বিষয়েও ঘোষণা করা হয় যে, কিতাবুস সুন্নাতুননবুয়াত' পুস্তকটি মৌলবী মহম্মদ হোসেনের কাছ থেকে চেয়ে পাঠাতে পারেন, যার মূল্য ৮ আনা এবং লাহোরে সহজলভ্য।"

উক্ত ইশতেহারে ডক্টর ক্লার্ক জান্ডিয়ালার মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে লেখেন-

"আপনারা একজন এমন বুযুর্গকে বিতর্কের জন্য পেশ করছেন, যাকে প্রথমত একজন মুহাম্মদী সদস্য গণ্য করাও কঠিন। আপনারা কোন্ চিন্তাধারা অনুসরণ করছেন? পাঞ্জাব এবং সারা ভারতের ইসলামের উলেমাগণ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর উদ্দেশ্যে যে ফতোয়া দিয়েছেন, সেটি কি আপনারা দেখেন নি? "

তিনি একথাও লেখেন: আপনাদের উদাসীনতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। এখনও পর্যন্ত এই পুস্তক (অর্থাৎ ইশায়াতুস সুন্নাহ- লেখক) দেখেন নি। আপনাদের জন্য এবং জান্ডিয়ালার মুসলমানদের উদ্যম দেখে চমতকৃত হতে হয়। যে ব্যক্তির জানাযা পড়াও বৈধ নয়, তাকেই কি না আপনারা নিজেদের নেতা নির্ধারণ করেছেন! চমৎকার! আপনাদের এই ভালমানুষি!

(সাচ্চাই কা ইযহার, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৭৩)

কিন্তু জান্ডিয়ালার মুসলমানেরা এই ইশতেহার দেখে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নি। মিঞা মহম্মদ বখশ সাহেব পাদ্রী সাহেবদেরকে দাঁতভাঙা উত্তর দেন। তিনি লেখেন-

"কোনও ধর্মই বিতর্কশূন্য নয়, এমনকি খৃষ্টধর্মও এর ব্যতিক্রম নয়। আর আমরা এমন মৌলবীদেরকে নৈরাজ্যবাদী মনে করি যারা ইসলামের সহায়ক একজন মুসলমানকে কাফের আখ্যা দেয়।"

(সাচ্চাই কা ইযহার, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৭৩-৭৪)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও স্বয়ং পাদ্রীদের কাছে একথা স্পষ্ট করে দেন যে, আপনাদের লেখা চিঠি, প্রতিশ্রুতি এবং আপনাদের দ্বারা অনুমোদিত শর্তাবলী আমাদের কাছে রয়েছে। অতএব আপনাদেরকে এখন বিতর্ক করতে হবে, অন্যথায় পরাজয় স্বীকার করতে হবে। আপনারা যদি অন্য মৌলবীদের সঙ্গে বিতর্ক করতে চান, তবে প্রথমে সংবাদ পত্রিকায় অনুমোদিত বিতর্কে নিজেদের পরাজয় ঘোষণা করুন।

অবশেষে পাদ্রীরা যখন নিস্তার পাওয়ার কোনও পথ খুঁজে পেল না, তখন তারা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মোবাহাসার তিক্ত স্বাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হল। উভয় পক্ষের অনুমোদিত শর্তাবলী অনুসারে এই বিতর্কসভা ডক্টর ক্লার্ক-এর কুঠিতে অনুষ্ঠিত হয়, যা ২২ শে মে আরম্ভ হয়ে ৫জুন সমাপ্ত হয়।

এই পবিত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ক্রুশভঙ্গকারী বনাম ক্রুশীয় মতবাদের সমর্থকদের মাঝে। এই যুদ্ধে চালকের আসনে ছিলেন ইসলামের যোদ্ধা। আর এমনভাবে ক্রুশ ভঙ্গ হয়েছিল যে তা জোড়া লাগার মত অবস্থায় আর ছিল না। মুসলমান পক্ষ আনন্দ উদ্‌যাপন করে, অপরদিকে খৃষ্টবাদের সমর্থকদের মাথায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আধ্যাত্মিক অস্ত্র

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ দাজ্জালকে নিজ অস্ত্র (বর্শা) দ্বারা একবার আঘাতেই হত্যা করবেন। অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি লুদ-এর দরজায় তাকে হত্যা করবেন। আরবী ভাষায় আলাদ্দুর বহুবচন হল আল্লাদু। অর্থাৎ এমন লোক যারা যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং তকবতির্কে জয়লাভ করে। অতএব, এই হাদীসে এবিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ এবং তাঁর সঙ্গীরা দাজ্জালকে বিতর্কের দ্বার দিয়ে হত্যা করবেন। এভাবেই এই ভবিষ্যদ্বাণী স্বমহিমায় পূর্ণ হয়।

ক্রুশ ভঙ্গকারী হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মোনাযারার প্রারম্ভেই এমন এক আঘাত হানেন যার ফলে তাঁর প্রতিপক্ষ পাদ্রী আব্দুল্লাহ্ আথম এবং তাঁর সহায়কগণ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অর্ধ-মৃতবৎ হয়ে এপাশ ওপাশ করতে থাকলেও প্রকৃত উত্তর দিতে পারত না, আর তারা দেয়ও নি। তাঁর সেই সফল আঘাত এরূপ ছিল-

তিনি (আ.) বলেন: স্পষ্ট থাকে যে, এই বিতর্কে এটি অত্যন্ত জরুরী বিষয় এই যে আমাদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন হোক কিম্বা ডেপুটি অব্দুল্লাহ্ আথাম-এর পক্ষ থেকে কোনও উত্তর হোক তা যেন নিজের পক্ষ থেকে না হয়, বরং নিজের নিজের সেই ঐশী গ্রন্থের উদ্ধৃতি অনুসারে হয় যাকে দ্বিতীয় পক্ষ দলিল হিসেবে গণ্য করে। অনুরূপভাবে উপস্থাপিত প্রত্যেকটি দলিল এবং দাবিও যেন এই নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলে। মোটকথা কোনও পক্ষই যেন নিজের সেই গ্রন্থের বাণীর বাইরে না যায় যা দলিল হিসেবে গণ্য হতে পারে।"

(জঙ্গে মুকাদ্দস,রূহানী খাযায়েন, পৃ: ৮৯)

মোবাহাসার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখলে একথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, খৃষ্টান মোনাযির শেষ পর্যন্ত এই মানে উত্তীর্ণ হতে পারেন নি, বরং আশ্চর্যের বিষয় এই যে তিনি দাবি ও দলিলের পার্থক্যটুকু ধরতে পারেন নি। কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কুরআন করীম থেকে যে দাবি উপস্থাপন করেছেন তা প্রমাণ করতে যৌক্তিক দলিললও কুরআন মজীদ থেকেই উপস্থাপন করেছেন।

পাদ্রীদের প্রত্যাঘাত

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মোনাযারা চলাকালীন বার বার তাজা নিদর্শন প্রকাশকে জীবন্ত ধর্ম সনাক্তকরণের মান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর দাবীকারক পক্ষ যে পুস্তককে ইলহামী মনে করে তাতে মোমেনের জন্য বর্ণিত লক্ষণাবলী নিজের মধ্যে প্রমাণ করে দেখালে তবে সে প্রকৃত মুসলমান বা খৃষ্টান বিবেচিত হবে। আর তিনি অত্যন্ত জোরালোভাবে দাবি করেন যে কুরআন করীমে ঈমানের জন্য বর্ণিত লক্ষণাবলী নিজের সত্তায় প্রমাণ করে দেখাবেন। এক বছরের মধ্যে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন, এমন নিদর্শন প্রকাশ করবেন যা প্রতিপক্ষ কোনওভাবেই দেখাবার শক্তি রাখবে না।

পাদ্রী আব্দুল্লাহ্ আথাম এই আহ্বান স্বীকার করতেও দ্বিধা করেছিলেন। কিন্তু বেশ কয়েক দিন চিন্তাভাবনা করার পর এক সুপরিকল্পিত স্কীমের অধীনে নিজের পক্ষ থেকে এমন আঘাত হানলেন, যা নিয়ে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এই আঘাতে প্রতিপক্ষ অবশ্যই পর্যদুস্ত বলে গণ্য হবে আর আমাদের বিজয় ডঙ্কা বাজবে। সেই আঘাতটি ছিল, ২৬ শে মে মোবাহাসার দিন পাদ্রী আব্দুল্লাহ্ আথাম এই বয়ান লেখার নির্দেশ দেয় যে, " আমরা খৃষ্টানরা পুরোনো শিক্ষামালার জন্য নতুন নিদর্শনের কোনও প্রয়োজন দেখি না। আর এর জন্য নিজেদের মাঝে শক্তিও রাখি না। আমাদের সঙ্গে নিদর্শনের কোনও প্রতিশ্রুতি নেই, কিন্তু মহাশয় এ বিষয়ে যারপরনায় গর্বিত। নিদর্শন দেখতে আমার কোনও আপত্তি নেই।"

"আমরা এই তিন ব্যক্তিকে পেশ করছি যাদের মধ্যে একজন অন্ধ,

যুগ ইমামের বাণী

"যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুগুলিকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ প্রিয়ভাজন হওয়ার সম্মান লাভ হতে পারে না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৪)

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

একজন পঙ্গু এবং তৃতীয়জন মূক। এদের মধ্যে যে কোনও একজনকে সুস্থ-সবল করতে পারলে করুন। এই নিদর্শন দেখার পর আমাদের উপর যা কর্তব্য বর্তায় তা পালন করব। আপনার ভাষ্যমতেই আপনি এমন খোদায় বিশ্বাসী যিনি কেবল নামেই সর্বশক্তিমান নন, বরং প্রকৃতই সর্বশক্তিমান। তাই তিনি এদেরকে নিশ্চয় সুস্থ করতে পারবেন। অতএব, অধিক বিলম্বে কাজ কি? আর আপনার কথা মতই তিনি অবশ্যই সাধু ও সত্যবাদীদের সঙ্গে আছেন। আপনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির উপর অতি শীঘ্র কৃপা করুন। আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, আজকের এই ঘটনা সম্পর্কে যে খোদা দিব্যবাণীর মাধ্যমে আপনাকে সংবাদ দিয়ে রেখেছেন যে এই যুদ্ধ ও ময়দানে তোমার বিজয় লাভ হবে, তিনিই আপনাকে একথাও বলেছেন যে অন্ধ এবং অন্য কিছু ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হবে। অতএব সমস্ত খৃষ্টান ও মুসলমানদের সম্মুখে এখনই নিজের চ্যালেঞ্জ পূর্ণ করুন।”

(জঙ্গে মুকাদ্দাস, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৬, পৃ: ১৫০-১৫১)

পক্ষ ও বিপক্ষের বিপুল সমাবেশের সমক্ষে ক্রুশ-খণ্ডণকারী মসীহর উপর প্রতিপক্ষের এই আঘাত ঠিক সেকরম ছিল, যেরূপ হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবেলায় জাদুকরেরা ছড়ি ও রজ্জু নিক্ষেপ করে নিজেদের বিজয় ঘোষণা দিয়েছিল, যা আপাত দৃষ্টিতে উপস্থিত দর্শকদের সম্মুখে গতিশীল বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল। এতে হযরত মূসা (আ.)-এর মনেও এই আশঙ্কার উদ্রেক হয় যে পাছে খোদার সৃষ্টির উপর এদের জাদুর প্রভাব দেখে সত্য সংশয় যুক্ত না হয়ে পড়ে। তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সেই মুহূর্তেই নিজের ছড়ি নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন এবং সুসংবাদ দিলেন যে তুমিই বিজয়ী হবে। কিন্তু এখানে মোবাহাসার শ্রোতাদের মনে উৎকণ্ঠা তৈরী হলে তারা হয়তো চিন্তা করেছেন, এখন এই আক্রমণের জবাব কি দিতে পারবেন? অপরদিকে খৃষ্টানরা তো মনে মনে উল্লসিত হচ্ছিল, একথা ভেবে যে আমরা এমন জায়গায় আঘাত করেছি যা অবশ্যই আমাদেরকে বিজয় এনে দিবে। কিন্তু খোদার সিংহ প্রশান্ত চিত্ত ও নিরুদ্বিগ্ন হয়ে বসেছিলেন, যিনি পূর্বাহ্নেই চিরঞ্জীব ও সর্বশক্তিমান খোদার পক্ষ থেকে বিজয়ের সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি নির্লিপ্ত ও নির্বিকার ছিলেন আর পাদ্রীদের ধোঁকাকে খান খান করে দেখানোর জন্য অধীর হয়ে নিজের পালার অপেক্ষা করছিলেন। পাদ্রী আথাম সাহেব যখন নিজের বয়ান নথিভুক্ত করিয়ে ফেললেন এবং তাঁর নিজের বয়ান নথিভুক্ত করানোর পালা এল, তখন তিনি প্রবল রূদ্রমূর্তিতে নিজের বয়ান লেখাতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, আপনি যদি সত্যিকার খৃষ্টান হয়ে থাকেন, তবে বলুন- 'আপনাদের ধর্মে হযরত ঈসা (আ.) মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দা অর্থাৎ প্রকৃত ঈমানদারদের যে সকল বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, সেগুলি আপনাদের মধ্যে কোথায়? যেমন মারাকাস ১৬/১৭ তে লেখা আছে- ' আর যারা ঈমান আনয়ন করবে, তাদের এই এই বৈশিষ্ট হবে.... তারা ব্যধিগ্রস্থদের উপর হাত রাখামাত্রই তারা সুস্থ হয়ে উঠবে।”

“তাই এখন আমি সবিনয় নিবেদন করছি, আর এই কথাগুলিতে যদি কোনও প্রকার অতিরঞ্জতা থাকে, তবে তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। এই যে তিন জন ব্যধিগ্রস্থদের আপনি নিয়ে এসেছেন, হযরত মসীহ এগুলিকে তো খৃষ্টানদের বিশেষ লক্ষণ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছেন, যদি তোমরা সত্যিকার ঈমানদার হও, তবে ব্যধিগ্রস্থদেরকে হাতের স্পর্শ দ্বারা সুস্থ করে দেওয়াই তোমাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে। ভুলত্রুটি মার্জনীয়, যদি প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার আপনার দাবি থাকে, তবে এখন আপনাদের উপস্থাপিত এই তিনজন ব্যধিগ্রস্থ হাতের কাছে রয়েছে, এদের উপর হাত রাখুন। যদি এরা সুস্থ হয়ে ওঠে তবে আমি স্বীকার করে নিব যে নিশ্চয় আপনি প্রকৃত ঈমানদার এবং মুক্তিপ্রাপ্ত। অন্যথায় এমনটি মেনে নেওয়ার কোনও উপায় থাকবে না। কেননা হযরত মসীহ একথাও বলেছেন যে, যদি তোমাদের মাঝে সর্ষে দানা পরিমাণ ঈমানও থাকত, তবে তোমরা পর্বতকে সরে যেতে বললে সে সরে যেত। যাইহোক এই মুহূর্তে আমি আপনাকে পর্বতকে স্থানচ্যুত করতে বলছি না, কেননা সেটি আমাদের এখান থেকে দূরে অবস্থিত। কিন্তু এটা খুবই ভাল বন্দোবস্ত হয়েছে, ব্যধিগ্রস্থদের আপনি নিজেই উপস্থাপন করেছেন। এখন আপনি এদেরকে হাতের স্পর্শ দ্বারা সুস্থ করে দেখান। অন্যথায় সর্ষে দানা পরিমাণ ঈমানের দাবি টুকুও টিকবে না।

কিন্তু আপনার নিকট স্পষ্ট থাকে যে, আমার উপর এই অভিযোগ বর্তায় না। কেননা, মহাসম্মানিত আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে আমাদের জন্য এই লক্ষণ বর্ণনা করেন নি যে এটিই তোমাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হবে। যখন তোমরা ব্যাধিগ্রস্থদের স্পর্শ করবে তারা সুস্থ হয়ে উঠবে। তবে তিনি একথা অবশ্যই বলেছেন যে আমি নিজের ইচ্ছানুসারে তোমাদের দোয়াসমূহ গ্রহণ করব। আর এটুকু না হলে অন্ততপক্ষে যদি কোনও দোয়া গৃহীত হওয়ার অনুপযুক্ত হয় এবং ঐশী প্রজ্ঞার পরিপন্থী হয়, তবে সেক্ষেত্রে সংবাদ প্রদান করা হবে। কোথাও একথা বলেন নি যে, তোমাদেরকে অমুক অমুক শক্তি প্রদান করা হবে, আর নিজের ইচ্ছায় যা কিছু করে ফেলতে পারবে। কিন্তু হযরত মসীহ্‌র উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তিনি ব্যাধিগ্রস্থদের ব্যাধিমুক্ত করার জন্য নিজ অনুগামীদের এক্তিয়ার দিয়েছেন। যেমনটি মতি ১ম অধ্যায়ে লেখা আছে- এখন আপনাদের কর্তব্য এবং ঈমানদারির অনিবার্য নিদর্শন হল আপনারা এই ব্যধিগ্রস্থদের সুস্থ করে দেখাবেন, অন্যথায় স্বীকার করুন যে, আমাদের মধ্যে এক সর্ষে পরিমাণ ঈমানও নেই। .... আপনাদের বিশ্বাস, আজও হযরত মসীহ যিনি চিরঞ্জীব ও সর্বশক্তিমান ও অদৃষ্টপরিজ্ঞাত, সর্বক্ষণ আপনাদের সঙ্গে রয়েছেন। আপনারা যা কামনা করেন, তিনি তাই দিতে পারেন। অতএব, আপনারা হযরত মসীহ্‌র কাছে আবেদন করুন যে এই তিনজন ব্যধিগ্রস্থকে আপনাদের হাতের স্পর্শে নিরাময় করে তুলুন, যাতে আপনাদের মাঝে ঈমানদারির বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থাকে। অন্যথায় এটি তো সঙ্গত নয় যে একদিকে সত্যপক্ষের বিরুদ্ধে খৃষ্টান হিসেবে মোবাহাসা করবেন আর যখন সত্যিকার খৃষ্টান হওয়ার নিদর্শন চাওয়া হয়, তখন বলবেন আমাদের মাঝে এর সামর্থ নেই। এমন বিবৃতি দিয়ে আপনি এই স্বীকারুক্তিতে মোহর লাগাচ্ছেন যে আপনাদের ধর্ম এই মুহূর্তে আর জীবিত ধর্ম নেই। কিন্তু যেভাবে খোদা তা'লা আমাকে নিজের ঈমানদার হওয়ার নিদর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ঠিক সেভাবেই নিদর্শন প্রকাশের জন্য আমি প্রস্তুত। আর যদি না নিদর্শন দেখাতে পারি, তবে যে শাস্তিই দিন আর যেভাবেই দিন তা শিরোধার্য করছি।”

(জঙ্গে মুকাদ্দস, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৬, পৃ: ১৫৩-১৫৫)

তিনি একথাও বলেন যে, হযরত মসীহ স্বয়ং নিজের শক্তিতে নিদর্শন দেখাতে অপারগ ছিলেন। যেমনটি মারাকাস, ৮/১১, ১১ তে লেখা আছে-

..... আর তার সঙ্গে হুজ্জত করে অর্থাৎ যেভাবে এখন আমার সঙ্গে হুজ্জত করা হয়েছে, তার পরীক্ষার জন্য স্বর্গলোক থেকে কোনও নিদর্শন চেয়েছে। সে অন্তরের অব্যক্ত বেদনা নিয়ে

এরপর শেষের পাতায়...

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। (সুনান আবু দাউদ)**

দোয়াপ্রার্থী: Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur (Murshidabad)

যুগ খলীফার বাণী

“আপনাদের যাবতীয় চিন্তা জাগতিকতাকে ঘিরে যেন না হয়, বরং ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতিই যেন প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়। এর ফলে জাগতিকতা ও ধর্ম, উভয় দিকই লাভবান হবে।”

(স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ার-এর বিশেষ বার্তা, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)

শত্রুদের ধ্বংসের নিরিখে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর সত্যতার প্রমাণ

সৈয়্যদানা হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) -রচিত হাকীকাতুল ওহী পুস্তক থেকে তাঁর দুই বিরুদ্ধবাদীর দৃষ্টান্তমূলক পরিণতির বিবরণ তুলে ধরা হল। এই দুই বিরুদ্ধবাদী তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। তাদের মৃত্যু এবং দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ

লাহোরের একাউন্ট্যান্ট মুনশী ইলাহি বখশ সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ,)-এর শিষ্যদের অন্যতম। নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় তিনি অগ্রগামী ছিলেন। সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ১৮৮৯ সালে যখন বয়আতের মাধ্যমে জামাতের ভিত্তি স্থাপন করলেন এবং শিষ্যদেরকে বয়আতের অন্তর্ভুক্ত হতে বললেন, তখন তিনি হঠাৎই বেঁকে বসেন। কাদিয়ান এসে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে তিনি বেশ দাপুটে ভঙ্গিতে নিজের স্বপ্ন এবং ইলহামের কথা শুনিয়ে বললেন, একটি স্বপ্নে আমি দেখছি আমি আপানাকে বলছি, 'আমি আপনার বয়আত কেন করব? আপনি আমার বয়আত করুন।' হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর পুরোনো বন্ধুকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করার নিমিত্তে অভূতপূর্ব পুস্তক 'জরুরাতুল ইমাম' (ইমামের আবশ্যকতা) রচনা করে তাঁকে সর্বতোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তিনি বয়আত ও ইলহামের তাৎপর্যের বিষয়েও অত্যন্ত মূল্যবান ও তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এই পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হচ্ছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইলাহি বখশ সাহেবকে বলেন-

হে আমার প্রিয় বন্ধু! অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ঐশী তত্ত্বজ্ঞান ও কল্যাণের জন্য আমি এমন ক্ষুধাতুর ও পিয়াসী যে, এক সমুদ্র পান করিয়াও আমার তৃপ্তি হইবে না। যদি কেহ আমাকে তাহার গোলামীতে বরণ করিতে চাহে, তবে ইহা অতি সহজ পন্থা হবে যে, বয়আতের তাৎপর্য এবং ইহার আসল দর্শনকে হৃদয়াঙ্গম করিয়া সে যেন আমার সহিত এই ক্রয়-বিক্রয় করিয়া নেয়। যদি তাহার নিকট এইরূপ অকাট্য যুক্তি প্রমাণ ঐশী তত্ত্ব-জ্ঞান ও আশিস ও কল্যাণ থাকে যাহা আমি প্রাপ্ত হই নাই এবং ঐ কুরআনী-তত্ত্ব তাহার নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকে, যাহা আমার নিকট হয় নাই,তবে বিসমিল্লাহ্! সেই বযুর্গকে আমি আমার গোলামী এবং আনুগত্যের অঙ্গীকার দিতে প্রস্তুত। তিনি আমাকে সেই আধ্যাত্মিক মা'রেফাত,কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান এবং ঐশী আশিস দান করুন। আমি বেশি কষ্ট দিতে চাহি না। আমার ঐশীবাণী-প্রাপ্ত বন্ধুবর কোন এক মজলিসে শুধু সূরা ইখলাসের তত্ত্বাবলী ব্যাখ্যা করুন। আমি যদি তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণ উত্তম ব্যাখ্যা দিতে না পারি, তাহা হইলে আমি তাহার আনুগত্য স্বীকার করিব।"

(জরুরাতুল ইমাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৩, পৃ: ৪৯৮)

তিনি আরও বলেন:

"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার বিজ্ঞ বন্ধু মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব ওয়াজ করিবার সময় কুরআন শরীফের যেরূপ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, উহার সহাস্রাংসের একাংশও আমার প্রিয় বন্ধুটির মুখ হইতে নিঃসৃত হইবে বলিয়া আদৌ আশা করি না।"

(জরুরাতুল ইমাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৩, পৃ: ৪৯৯)

তিনি আরও বলেন:

"আমার জামাতে আমার হস্তে বয়আতকারী আল্লাহ্‌র দাসগণের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছেন যিনি মর্যাদাশীল জ্ঞানী। তাঁহার নাম মৌলবী হাকীম হাফিয হাজীউল হারামাঈন নূরুদ্দীন সাহেব। মনে হয় যেন তিনি সারা দুনিয়ার তফসীর নিজের আয়ত্তে রাখেন। তেমনি তাঁহার হৃদয় কুরআনের অজস্র তত্ত্ব-জ্ঞানের ভাণ্ডারস্বরূপ। যদি সত্য সত্যই আপনাকে এখন বয়আত গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে কুরআনের একটি মাত্র পারা এবং উহার তত্ত্ব-জ্ঞান ব্যাখ্যাসহ তাঁহাকে পড়াইয়া দিন। এই লোকগুলি তো উন্মাদ নহেন যে, অপর মুলহামগণকে ছাড়িয়া আমার হস্তেই বয়আত করিবেন!

(জরুরাতুল ইমাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৩, পৃ: ৫০০)

তিনি আরও বলেন:

যদি তিনি আপন ইলহামী শক্তিতে উল্লেখিত মৌলবী সাহেবকে কুরআনের জ্ঞান সম্বন্ধে নমুনা দেখাইতে পারেন এবং এইরূপ অসাধারণ ক্রিয়ার আলোক-প্রভায় নূরুদ্দীনের ন্যায় কুরআনের অনুরাগী ব্যক্তিকে শিষ্য করিতে পারেন তাহা হইলে আমি এবং আমার জামাত আপনার জন্য আত্মোৎসর্গ করিব।

(জরুরাতুল ইমাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৩, পৃ: ৫০১)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.): উজ্জ্বল নিদর্শন বাবু ইলাহি বখশ একাউন্ট্যান্ট পেনশনারা লাহোর মিথ্যাবাদী মূসা মারা গেল।"- শিরোণামে জামাতকে তার মৃত্যু সংবাদ প্রদান করতে গিয়ে বলেন:

শ্রোতাবর্গ নিশ্চয় অবগত আছেন যে, ইলাহি বখশ নামে লাহোরে এক একাউন্ট্যান্ট ছিল। যখন আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্ত হয়ে একথা প্রকাশ করেছিলাম যে,'আমি প্রতিশ্রুত মসীহ', সেই যুগে আমার থেকে দূরে সরে গিয়ে সে নিজেকে মূসা বলে দাবি করল। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হল, উল্লেখিত ইলাহি বখশ দীর্ঘকাল আমার সঙ্গে ভক্তি ও অনুরাগের সম্পর্ক রাখত। বহুবার কাদিয়ান এসেছে। আর সে আমাকে খোদার পক্ষ থেকে একজন সত্যিকার মুলহাম বলে বিশ্বাস করত এবং আমার খিদমত করত। অনেক সময় এমনও হয়েছে যে, ভোরের নামাযের পর অমৃতসরে চাদর মুড়ি দিয়ে যখন ঘুমিয়েছি, তখন এক ব্যক্তি এসে পা-মর্দন করতে আরম্ভ করেছে। আমি চাদর থেকে মুখ বের করি দেখি সেই ইলাহি বখশই ছিল। একথা লেখার উদ্দেশ্য হল, আমার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে কোনও প্রকার খিদমত করতে দ্বিধা বোধ করত না। একান্ত বিনয় সহকারে নিজেকে একজন সামান্য সেবক মনে করত। আর্থিক ত্যাগ-স্বীকারের ক্ষেত্রেও সাধ্যমত চেষ্টা করত, কখনও পশ্চাদপদ হত না। যতদিন খোদা চেয়েছেন, সে এমনই নিষ্ঠাবান অবস্থায় থেকেছে। আমার অনেক আশা ছিল যে নিষ্ঠায় সে অনেক উন্নতি করবে। আর আমি যখন লুধিয়ানা বা আম্বালা বা অন্যত্র কোনও কাজের জন্য কাদিয়ান থেকে বের হতাম, তবে সুযোগ পেলেই সে সেখানেও পৌঁছে যেত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঙ্গী থাকত মুনশী আব্দুল হক। অতঃপর কিছুকাল পর তার মনে এই ধারণার উদ্রেক হল যে, তার উপর ইলহাম হয়। এটিই সেই বিষাক্ত বীজ ছিল, যা নিয়তি তার মধ্যে বপন করেছিল। এরপর তার মধ্যে নিষ্ঠার অবস্থায় পরিবর্তন আরম্ভ হতে থাকে। যে যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে লোকের বয়আত নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন, এবং চল্লিশ বা ততোধিক মানুষ বয়আতের অন্তর্ভুক্ত হল, এবং খোদার আদেশ অনুসারে এই সংবাদ সর্বজনীন করা হল যে, যে ব্যক্তি ভক্তি ও অনুরাগের সম্পর্ক রাখে সে যেন বয়আতের অন্তর্ভুক্ত হয়, ঠিক তখন একথা শোনার পর ইলাহি বখশের অন্তরে কলুষতা সৃষ্টি হয়। কিছু কাল পর সে তার বন্ধু মুনশী আব্দুল হকের সঙ্গে নিজের ইলহাম শোনানোর উদ্দেশ্যে আমার কাছে কাদিয়ান আসে। এবার তার স্বভাবে এতটাই কঠোরতা ও কর্কশতা ছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন এ সেই ইলাহি বখশ ছিল না। সে ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে নিজের ইলহাম শোনানো আরম্ভ করল। এগুলি লেখা ছিল ছোট্ট একটি এলবামে, যেটি তার পকেটে রাখা ছিল। এগুলির মধ্য থেকে এই মর্মে একটি (ইলহাম) শোনায় যে, 'স্বপ্নে আমি দেখেছি, আপনি আমাকে বয়আত করতে বলছেন। আর আমি উত্তর দিচ্ছি, বয়আত করব না, বরং আপনিই আমার বয়আত করুন।' এই ইলহামটির কারণে তার আপাদ-মস্তক গর্ব ও অহঙ্কারে পূর্ণ হয়ে গেল। আর সে মনে করল, আমি এমন একজন বুজুর্গ যার বয়আত করার প্রয়োজন নেই। বরং আমার বয়আত করা উচিত। বস্তুত এটি শয়তানী কুমন্ত্রণা ছিল যা তার হোঁচট খাওয়ার কারণ হয়েছে। আসল কথা হল, মানুষের মনে যখন আত্মম্ভরিতা ও কুফর লুকিয়ে থাকে, তখন সেটিই তার মনের কথা হয়ে স্বপ্নে রূপান্তরিত হয়।

আর একজন নির্বোধ মনে করে বসে যে এটি খোদার পক্ষ থেকে। অথচ সেই কুফর কেবল তার অব্যক্ত চিন্তাধারার ফসল, খোদার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক থাকে না। শত শত অজ্ঞ কেবল প্রবৃত্তির প্ররোচনায় ধ্বংস হয়ে যায়।মোটকথা ইলাহি বখশ চরম ঔদ্ধত্য ও আস্ফালন নিয়ে আমাকে স্বপ্ন শুনিয়েছিল। তার এই নির্বুদ্ধিতা দেখে আমার আক্ষেপ হত। কেননা, আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম যে, সে যা কিছু শোনাচ্ছে তা প্রবৃত্তির প্রলাপ মাত্র। কিন্তু আমি যেহেতু তার অন্তরের আত্মশ্লাঘা অনুভব করেছি, দাম্ভিকতার লক্ষণ দেখেছি। তার কথাবার্তায় উগ্রতা পাওয়া গেছে। তাই তাকে উপদেশ হিসেবে কিছু কথা বলা নিরর্থক মনে করলাম। অধিকাংশ মানুষই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তাদের মুখ নিঃসৃত কথাকে খোদার বাণী আখ্যায়িত করে এবং 'লা তাক্ফু মা লাইসা লাকা বিহি ইলম'-আয়াতের অধীনে চলে আসে। এটি আক্ষেপের বিষয়। স্মরণ রাখা উচিত যে, যদি কোনও বাণী মুখে এসে থাকে, আর তা খোদার ও তাঁর রসূলের বাণীর পরিপন্থী না হলেও, সেটিকে খোদার বাণী বলা যেতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদার কর্ম এর সাক্ষী দেয়। কেননা বিতাড়িত শয়তান, যে কিনা মানুষের শত্রু, যেভাবে আরও অন্যান্য উপায়ে মানুষকে ধ্বংস করতে চায়, অনুরূপভাবে এই পথভ্রষ্টকারীর আরও একটি পন্থা হল নিজের কথাকে মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়ে তাকে আশ্বস্ত করে যে সেটি খোদার বাণী আর পরিশেষে এমন ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

অতএব, কারো উপর যখন কোনও বাণী অবতীর্ণ হয়, তার মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকে, সেটিকে খোদার বাণী হিসেবে দাবি করা নিজের ধ্বংস ডেকে আনার নামান্তর।

প্রথমত: সেই বাণী কুরআন করীমের পরিপন্থী যেন না হয়, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটি তৃতীয় লক্ষণ ব্যাতিরেকে অসম্পূর্ণ যা নীচে উল্লেখ করা হচ্ছে। বরং তৃতীয় লক্ষণ না থাকলে এর দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত: সেই বাণী যেন এমন ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হয়, যার আত্মশুদ্ধি ভালভাবে হয়েছে এবং সেই সকল আত্মবিলীনকারীদের জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয় যারা প্রবৃত্তির আবেগ ও স্থূলতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করেছে আর যাদের আত্মার উপর এমন এক মৃত্যু এসেছে যার মাধ্যমে তারা খোদার নৈকট্যভাজন লাভ করে শয়তান থেকে দূরে চলে যায়। কেননা, যে ব্যক্তি যার নিকট রয়েছে সে তার কথা-ই শোনে। আত্মশুদ্ধিই হল মানুষের পরম সাধনা, যেখানে এসে তার আধ্যাত্মিকতার সমস্ত যাত্রা শেষ হয়। ভিন্ন কথায় এটি এমন এক মৃত্যু যা ভিতরের যাবতীয় কলুষকে ভস্মীভূত করে দেয়। অতঃপর মানুষের আধ্যাত্মিক সফর শেষ হলে খোদার অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রয়োজন দেখা দেয়। যে বান্দা প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে দমন করে আত্মবিলীনতার মর্যাদায় উপনীত হয়েছে, খোদা তখন তাকে মারেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান এবং ভালবাসার জীবন দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করেন এবং নিজের অলৌকিক নিদর্শনাবলী দ্বারা আধ্যাত্মিকতার বিস্ময়কর পথে চালিত করেন। এবং তার হৃদয়কে নিজের এমন ব্যক্তিগত ভালবাসার আকর্ষণে পরিপূর্ণ করে দেন, যাকে জগত অনুভব করতে পারে না। এই অবস্থাকেই বলা হয় সে নবজীবন প্রাপ্ত হল, যার পর আর মৃত্যু আসে না।

অতএব এই নতুন জীবন পরিপূর্ণ মারেফাত এবং ভালবাসা দ্বারা অর্জিত হয়। আর পরিপূর্ণ মারেফাত অর্জিত হয় খোদার অলৌকিক নিদর্শন দ্বারা। এই পর্যায়ে পৌঁছনোর পরই মানুষ খোদার প্রকৃত বার্তালাপ ও সম্ভাষণ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই লক্ষণটিও তৃতীয় পর্যায়ের লক্ষণ ব্যতিরেকে প্রশান্তিদায়ক নয়, কেননা পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন এক গোপন বিষয়। অতএব, প্রত্যেক প্রলাপকারী এমন দাবি করতে পারে।

সত্যিকার মুলহাম-এর তৃতীয় লক্ষণ হল, যে বাণীকে খোদার প্রতি আরোপ করে, খোদার ধারাবাহিক কর্মধারা যেন তার সাক্ষী দেয়। অর্থাৎ তার সমর্থনে যেন এমনভাবে নিদর্শন প্রকাশিত হয় যে সুস্থ বিবেক এমন নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও সেটিকে খোদার বাণী বলে ধরে নিতে বাধা দেয়। আর বস্তুত এই লক্ষণটি অন্যান্য লক্ষণাবলীর থেকে উৎকৃষ্ট। কেননা এটি সম্ভব যে, একটি বাণী যা কারো মুখ থেকে নিঃসৃত হল বা কেউ ইলহাম হিসেবে উপস্থাপন করল, তা অর্থের দিক থেকে কুরআন করীমের বর্ণনার পরিপন্থী নয়, বরং অনুসারী । কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি কোনও মিথ্যুকের রচনা হতে পারে, কেননা একজন বুদ্ধিমান যে কিনা মুসলমান, কিন্তু মিথ্যা রচনাকারী, সে অবশ্যই এ বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখবে যে, কুরআন শরীফের বিরুদ্ধে কোনও বাণী ইলহাম হিসেবে যেন উপস্থাপন না করে, অন্যথায় অযথায় লোকের ওজর আপত্তির লক্ষ্যে পরিণত হবে। এছাড়াও এও সম্ভব যে, সেই বাণী তার প্রবৃত্তির প্রলাপ, অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকে মুখে কোনও বাণী এসেছে। যেমন অধিকাংশ ছেলে যারা দিনে বই পড়ে, রাতে অনেক সময় সেই কথাগুলি তাদের মুখে থাকে। মোটকথা কোনও বাণী যা ইলহামের দাবী হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, তা কুরআন শরীফ অনুসারে হওয়া একথার অকাট্য প্রমাণ নয় যে সেটি অবশ্যই খোদার বাণী। এটি কি সম্ভব নয় যে একটি বাণী অর্থের দিক দিয়ে খোদার বাণীর পরিপন্থীও নয়, অথচ সেটি কোনও মিথ্যারচনাকারীর বাণীও হতে পারে। কেননা, একজন মিথ্যারচনাকারী অনায়াসেই এমন কাজ করতে পারে। কুরআন করীমের শিক্ষা অনুসারে একটি বাণী উপস্থাপন করে সে দাবী করবে এটি খোদার কালাম যা আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। আর এমন বাণী হয় প্রবৃত্তির প্রলাপ হতে পারে কিম্বা শয়তানের বাণী হতে পারে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় শর্তটিও রয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইলহামের দাবি করবে সে যে আত্মশুদ্ধি করেছে, এমনটি সুনিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে না। বরং এটি এক গোপন বিষয়। আর অনেক অপবিত্র প্রকৃতির মানুষ এবিষয়ের দাবি করতে পারে যে, আমাদের আত্মা শুদ্ধ ও পবিত্র, খোদার প্রতি আমাদের ভালবাসা অকৃত্রিম। কাজেই সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া মোটেই সহজ কাজ নয়। এই কারণেই অনেক অপবিত্র প্রকৃতির মানুষ সেই সব পবিত্রাত্মাদের উপর জঘন্য অপবাদ আরোপ করেছে যারা আত্মশুদ্ধি করেছিল। যেমন আজকের যুগের পাদ্রীরা আমাদের সৈয়্যদ ও মৌলা আঁ হযরত (সা.)-এর উপর অপবাদ আরোপ করে। এবং তারা বলে (নাউযুবিল্লাহ্) তিনি প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অনুসরণ করতেন। যেমনটি তাদের হাজার হাজার পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকাদিতে এমন অপবাদ পাওয় যায়। ঠিক একই রকমভাবে ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ.)এর উপর বিভিন্ন প্রকারের অপবাদ আরোপ করে থাকে। কিছুকাল পূর্বেই আমি ইহুদীদের একটি পুস্তক দেখছিলাম, যাতে কেবল এই কদর্য অভিযোগই ছিল না যে নাউযু বিল্লাহ্ হযরত ঈসা অবৈধ সন্তান ছিলেন, এমনকি চালচলন সম্পর্কেও অত্যন্ত নোংরা অপবাদ আরোপ করেছিল। আর তাঁর সঙ্গে যে কয়েকজন মহিলা সেবারত ছিল, তাদের সম্পর্কে ভীষণ নোংরা কথাবার্তার উল্লেখ করা হয়েছিল। অতএব নোংরা ও দুশ্চরিত্র শত্রুরা যখন এমন পবিত্র প্রবৃত্তির মানুষদেরকে কামলোলুপ বলে আখ্যায়িত করেছে এবং তাদেরকে আত্মশুদ্ধির বাইরে রেখেছে। এর থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি অনুধাবন করতে পারে যে, আত্মশুদ্ধির মর্যাদা শত্রুদের নিকট প্রকাশিত হওয়া কতটা কঠিন। এই কারণেই আর্যরা খোদা তা'লার সকল নবীকে বিশ্বাসঘাতক এবং কামপ্রবৃত্তির দাস আখ্যা দেয় আর তাদের যুগকে ছলচাতুরির যুগ হিসেবে গণ্য করে।

কিন্তু এই তৃতীয় লক্ষণে যে বলা হয়েছে, ইলহাম ও ওহী যা বাণী মাত্র, এর সঙ্গে খোদার কোনও কর্মও যুক্ত হওয়া শর্তসাপেক্ষ। এটি এমন পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট যাকে কেউ ভাঙতে পারবে না। এই লক্ষণের মাধ্যমেই খোদা সত্য নবী মিথ্যাবাদীদের উপর জয়যুক্ত হয়ে এসেছেন। কেননা যে বক্তি দাবী করে যে আমার উপর খোদার বাণী অবতীর্ণ হয়, এবং তার সঙ্গে শত সহস্র নিদর্শন প্রকাশিত হয় এবং হাজার হাজার প্রকারের সমর্থন ও ঐশী সাহায্য সংযুক্ত হয় আর তার শত্রুদের উপর খোদার পক্ষ থেকে প্রকাশ্য আক্রমণ হয়, এমন ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলতে পারে, কার এমন সাধ্য? কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হল অনেক মানুষ এমনও আছে যারা এই পরীক্ষায় নিপতিত হয়ে প্রবৃত্তির কোনও প্রলাপ বা শয়তানী কুমন্ত্রণার ফাঁদে পড়ে সেটিকে খোদার বাণী মনে করে বসে, অথচ কর্মগত সাক্ষীর কোনও তোয়াক্কা করে না।

তবে এও সম্ভব যে, কেউ কেউ

কখন কখন কোন সত্য স্বপ্ন দেখে বা সত্য ইলহাম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তারা এতটুকুর দ্বারাই খোদার প্রত্যাদিষ্ট আখ্যায়িত হতে পারে না। কিম্বা এমন দাবিও করতে পারে না যে সে প্রবৃত্তির অন্ধকার থেকে মুক্ত। বরং এই ধরণের স্বপ্ন ও ইলহামে প্রায় সমগ্র জগত শরিক আছে। আর এটি এমন বিরাট কিছু নয়। স্বপ্ন বা ইলহাম প্রাপ্ত হওয়ার গুণ মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে এজন্য রাখা হয়েছে যাতে একজন বুদ্ধিমান মানুষের খোদার সম্মানীয় রসুল সম্পর্কে অসৎ প্রতীতি না জন্মে। এবং এই সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিতে ইলহামের বীজ বপিত আছে, কাজেই এর পূর্ণতা লাভকে অস্বীকার করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

কিন্তু যারা খোদার নিকট ইলহাম ও ঐশী-সম্ভাষণ প্রাপ্ত হিসেবে পরিচিত, এবং খোদার সঙ্গে বার্তালাপ ও সম্ভাষণের সম্মানে ভূষিত হয়ে মানুষকে (খোদার দিকে) আহ্বান করার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়ে থাকেন, তাঁদের সমর্থনে খোদার নিদর্শন বৃষ্টিধারার ন্যায় বর্ষিত হয়। পৃথিবী তাদের মোকাবেলা করতে পারে না। ঐশী ক্রিয়াকলাপ নিজের আধিক্য দ্বারা সাক্ষী দেয়, যে বাণী তারা উপস্থাপন করে তা ঐশীবাণী। ইলহামের দাবিদার যদি এই লক্ষণটিকে দৃষ্টিপটে রাখত তবে এই কলহ থেকে রক্ষা পেত।

অনুরূপভাবে ইলাহি বখশ যদি এই বিষয়টি নিয়ে কিছু চিন্তাভাবনা করত যে কতটা তার সমর্থনে খোদা তা'লার সাহায্য ও সমর্থন এসেছে আর সাধারণ মানুষের তুলনায় তাকে বিশিষ্টতা দেওয়া হয়েছে-তবে সে এই পরীক্ষায় নিপতিত হত না। এখন বড়ই আক্ষেপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, মৃত্যুর পর সে মিথ্যা রচনার এক স্তুপ রেখে গেছে। আমার সম্পর্কে সে এই মর্মে ইলহাম উপস্থাপন করেছিল যে আমার জীবদ্দশায় এই ব্যক্তি প্লেগে মারা যাবে আর তার গোটা জামাত ছত্রভঙ্গ পয়ে পড়বে। এখন সে নিজেই প্লেগে ধ্বংস হল। আর তার দাবি ছিল আমার মূল উৎপাটন না করে সে মরবে না, কিন্তু সে স্বচক্ষে দেখল যে তার মিথ্যা ইলহামের পর আমার জামাতের সদস্য সংখ্যা কয়েক লক্ষে পৌঁছে গেছে। যখন সে এই ধরণের ইলহাম প্রকাশ করতে শুরু করেছিল, সেই সময় আমার জামাতে চল্লিশ জনের বেশি লোক ছিল না। আর ততদিন সে মারা যায় নি, যে পর্যন্ত না সর্বতোভাবে নিজের বিফলতা এবং আমার সফলতা দেখেছে। সে নিজের মিথ্যা ইলহামের ভরসায় আমার উপর দায়ের হওয়া প্রত্যেক মোকদ্দমায় একথাই মনে করত যে আমি শাস্তি পেয়ে যন্ত্রণাদায়ক আযাব ভোগ করব। অনুরূপভাবে এই ধরণের আরও ইলহাম তার উপর হত যেগুলি সে বন্ধুদের কাছে প্রচার করত। কিন্তু খোদা তা'লা প্রতিটি মোকদ্দমায় আমাকে সসম্মানে মুক্তি দান করতে থেকেছেন। আর চরম ব্যর্থতা নিয়ে সে মারা যায়। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে যখন সে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে চোখের সামনে মৃত্যুকে দেখতে পেল, তখন নিশ্চয় নিজের সমস্ত ইলহামকে শয়তানী বাক্য বলে বুঝতে পেরেছিল এবং তার মনে পড়েছিল যে সে ভ্রান্তিতে আছে। একথা একেবারে অযৌক্তিক এবং ধারণাতীত বলে হয় যে সে এত হোঁচট খাওয়ার পরও এবং যে প্লেগকে সে আমার প্রতি আরোপ করত নিজেকেই তাতে আক্রান্ত হতে দেখে এবং মৃত্যুশয্যায় আমার সফলতা কথা চিন্তা করেও পূর্বের অবস্থায় অনড় থেকেছে। সে মূসা হওয়ার দাবি করেছিল এবং পুস্তকের নাম রেখেছিল 'আসায়ে মূসা' (মূসার লাঠি)। যখন মনে পড়বে তার বাসনা ছিল এই 'আসা' (লাঠি) সেই ব্যক্তিকে ধ্বংস করবে যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার দাবী করে। যখন মনে পড়বে যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত মসীহ বলে দাবি করে তার সম্পর্কে সে নিজের রচিত পুস্তক 'আসায়ে মূসা'-য় দাবি করেছিল যে তার জীবদ্দশাতে সে প্লেগে মারা যাবে। যখন তার মনে পড়বে যে আমি এই পুস্তকেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, আমি ততদিন মরব না যতদিন নিজের এই শত্রুকে ধ্বংস হতে দেখি।' প্রত্যেকেই কল্পনা করতে পারে যে প্লেগাক্রান্ত অবস্থায় এই কথাগুলি স্মরণ করে সে কিরূপ মর্মবেদনা ও অন্তর্দহন ভোগ করছিল। একথা কে বিশ্বাস করতে পারে যে এমন বিফলতা ও তার যাবতীয় ইলহামের মিথ্যা উদ্ঘাটন হওয়ার পরও প্লেগাক্রান্ত অবস্থায় সে নিজেকে মূসা বলে বিশ্বাস করত? না, কখনোই নয়, নিশ্চয় প্লেগ তার সমস্ত চিন্তাধারাকে ভেঙে চুরমার করেছিল আর তাকে সতর্ক করেছিল যে সে ভ্রান্তিতে আছে। এই ঘটনার অনেক পূর্বেই খোদা তা'লা আমার নিকট একথা প্রকাশ করেছিলেন যে, সে তার ত্রুটিপূর্ণ চিন্তাধারাতে অনড় থাকবে না। অবশেষে সেই চিন্তাধারা থেকে ফিরে আসবে। অতএব, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, যখন সে অকস্মাৎ প্লেগ ও অকাল মৃত্যুর দৃশ্য দেখল, যার সম্পর্কে সে ভালভাবে জানত যে এটি অসময় এবং তার দাবির পরিপন্থী, তখন নিশ্চয় সেই দৃশ্য তাকে একথা বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে যে তার সমস্ত ইলহাম শয়তানী ছিল। এমন পরিস্থিতিতে নিজের অপূর্ণ বাসনা নিয়ে নিশ্চয় সে বুঝেছিল যে ,'আমি ভ্রান্তিতে ছিলাম। যা কিছু আমি বুঝেছিলাম তা খোদার পক্ষ থেকে ছিল না। ' পরবর্তীতে বর্ণনা করব যে এমনটি বোঝা তার জন্য আবশ্যক ছিল। কেননা এই মৃত্যু দৃশ্য দ্বারা তার ইলহামী বাক্যগুলি অকস্মাৎ এমনভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হল, যেভাবে কোনও প্রাচীর সহসায় ভেঙে পড়ে। এই প্লেগ থেকে আমার বেঁচে যাওয়া তার জন্য কল্পনাতীত ছিল। কেননা, ১৯০৭ সালের ৭ এপ্রিল যেদিন সে মারা গেল, তার পূর্বে লাহোরে এমন প্রবল ও ধ্বংসাত্মক প্লেগের প্রকোপ ছিল যে কোনও কোনও দিন দুশোর বেশি মানুষ মারা যেত। তার প্রিয় বন্ধু ঠিক এর আগের দিন মারা গিয়েছিল, যার জানাযায় গিয়ে সে প্লেগ কিনে আনে। অতএব এই প্রাণঘাতী ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কে বলতে পারে যে আমি রক্ষা পাব? বরং হাজার হাজার মানুষ প্লেগাক্রান্ত হওয়া মাত্রই উত্তরাধিকারীদের জন্য ওসীয়্যত লিখে দিত। মোটকথা প্লেগে আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই তার মুসায়ী নদী শুষ্ক হয়ে যায়। সে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুযাত্রা স্মরণ করে, বিশেষ করে ইয়াকুব-এর মৃত্যুর কথা কল্পনা করে বুঝে নেয় যে ,' আমি অবশ্যই মারা যাব।' এমতাবস্থায় সে কিভাবে একথার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে যে, 'আমি মূসা'? অতএব এটি খোদার কৃপা যে সে ত্রুটিপূর্ণ বিশ্বাস সঙ্গে নিয়ে যায় নি, খোদা তা'লা তাকে ঘাড় ধরে প্রত্যাবর্তন করিয়েছেন। এবং সে সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ

মহান বিজয়

আমেরিকার মিথ্যা নবী ডক্টর আলেক্সান্ডার ডুই আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ধ্বংস হল।

উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লেখেন- স্পষ্ট থাকে যে, প্রবন্ধের শিরোণামে উল্লেখিত ব্যক্তি ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল। এছাড়াও সে মিথ্যা নবী হওয়ার দাবি করেছিল এবং নবীকুলের সর্দার, সত্যবাদীদের শিরোমণি সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল এবং পবিত্রাত্মাদের নেতা জনাব পবিত্রতার সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত মহম্মদ মুস্তাফা (সা.)কে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারচনাকারী মনে করত। আর নিজের অপবিত্র প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে তাঁর নামে নোংরা গালি ও অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করত। মোট কথা দ্বীনে-মতীন (ইসলাম)-এর উপর বিদ্বেষের কারণে তার চরিত্র নিতান্ত অপবত্রি ছিল। যেমনটি কথায় আছে শূকর মুক্তোর মূল্য জানে না। অনুরূপভাবে সেও ইসলামের একত্ববাদকে অত্যন্ত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখত এবং ইসলামের মূল উৎপাটন করার বাসনা রাখত। সে হযরত ঈসা (আ.) কে খোদা জ্ঞান করত এবং ত্রিত্ববাদকে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তার মাঝে এতটাই ব্যগ্রতা ছিল যা আমার দেখা পাদ্রীদের লেখা অন্য কোনও পুস্তকে দেখি নি। ১৯০৩ সালে ১৯শে ডিসেম্বর এবং ১৯০৭ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখের তার নিজের পত্রিকা পুস্তক লিভস অফ হিলিং-এ একথা লেখা আছে-

'আমি খোদার কাছে দোয়া করি যেন সেই দিনটি শীঘ্র উপস্থিত হয়, যেদিন ইসলাম পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। হে খোদা! তুমি এমনটিই কর। হে খোদা! ইসলামকে ধ্বংস করে দাও।"

অতঃপর ১৯০৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে নিজেকে সত্য রসুল ও নবী আখ্যা দিয়ে ঘোষণা করে-

" আমি যদি সত্য নবী না হই, তবে ধরাপৃষ্ঠে এমন কোনও ব্যক্তি নেই যে খোদার নবী হতে পারে।"

এছাড়াও সে ঘোর পৌত্তলিক ছিল। সে দাবি করত যে, তার উপর ইলহাম হয়েছে যে, পঁচিশ বছরের মধ্যে ঈসু মসীহ আকাশ থেকে নেমে আসবেন। সে হযরত ঈসাকে সত্যিকার খোদা মনে করত। এরই

সঙ্গে আমার জন্য মর্মপীড়াদায়ক একটি বিষয় ছিল, যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি যে সে আমাদের নবী (সা.)-এর ঘোর শত্রু ছিল। আমি তার পত্রিকা 'লিভস অফ হিলিং'-এর গ্রাহক ছিলাম, যে কারণে তার নোংরা ভাষা সম্পর্কে আমি সবসময় সংবাদ পেতাম। তার আস্ফালন যখন সীমাতিক্রম করল, তখন আমি তার নামে ইংরেজিতে একটি চিঠি পাঠিয়ে তাকে মোবাহালার জন্য আবেদন করলাম, যাতে খোদা তা'লা আমাদের দুজনের মধ্যে মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদীর জীবদ্দশাতে মৃত্যু দেন। ১৯০২ এবং ১৯০৩ সালে মোট দুবার এই আবেদন তার নামে পাঠানো হয়েছিল, এমনকি আমেরিকার কিছু খ্যাতনামা সংবাদ পত্রিকাতেও ছাপানো হয়েছিল। পত্রিকাগুলির নাম টিকায় দেওয়া হল।

(হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ৩২টি সংবাদ পত্রিকার নাম প্রকাশ করেছেন যেগুলিতে এ বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সংকলক)

মোবাহালার এই প্রবন্ধে আমি মিথ্যাবাদীর উপর অভিসম্পাত করেছিলাম। এবং খোদার কাছে দোয়া করেছিলাম যে, তিনি যেন নিজের মীমাংসার মাধ্যমে মিথ্যাবাদীর মিথ্যা প্রকাশ করে দেন। আর যেমনটি আমি এইমাত্র উল্লেখ করেছি, আমার এই মোবাহালার প্রবন্ধটি আমেরিকার কিছু খ্যাতনাম দৈনিকে ভালভাবে ছাপানো হয়েছিল। পত্রিকাগুলির মালিক ছিল খৃষ্টান, যাদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক ছিল না। আর এটি পত্রিকায় ছাপানোর প্রয়োজন এজন্য দেখা দিয়েছিল যে মিথ্যানবী ডক্টর ডুই সরাসরি আমাকে উত্তর দেয় নি। অবশেষে আমি মোবাহালার প্রবন্ধটি আমেরিকার খ্যাতনামা দৈনিক সংবাদ পত্রগুলিতে প্রকাশ করাই যেগুলি সারা বিশ্বে ব্যাপক হারে প্রচারিত হত। যদিও আমেরিকার সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকগণ খৃষ্টান ছিলেন এবং ইসলামের বিরোধী ছিলেন, তা সত্ত্বেও তারা অতি উৎসাহে আমার মোবাহালার প্রবন্ধটিকে এমন ব্যপক হারে প্রকাশ করল যে আমেরিকা ও ইউরোপে তা নিয়ে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হল, এমনকি ভারত পর্যন্ত এই মোবাহালার সংবাদ পৌঁছে গেল। এটি খোদা তা'লারই কৃপা ও অনুগ্রহ ছিল। আমার মোবাহালার প্রবন্ধের সারাংশ এই ছিল যে, ইসলাম সত্য এবং খৃষ্টধর্মের মতবাদ মিথ্যা আর আমি খোদার পক্ষ থেকে সেই মসীহ, শেষ যুগে যার আগমণের এবং নবীদের গ্রন্থগুলিতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও আমি প্রবন্ধে একথা লিখেছিলাম যে, ডক্টর ডুই তার রসূল হওয়া দাবীতে এবং ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসে মিথ্যা। সে যদি আমার সঙ্গে মোবাহালা করে, তবে আমার জীবদ্দশাতেই নিজের অপূর্ণ বাসনা ও দুঃখ নিয়েই তার ভবলীলা সাঙ্গ হবে। আর যদি মোবাহালা নাও করে, তবু খোদার শাস্তি থেকে পালাতে পারবে না। এর উত্তরে সেই হতভাগা ১৯০৩ সালের ডিসম্বর মাসে তার কোনও একটি পত্রিকায় এবং ১৯০৩ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় নিজের পক্ষ থেকে কয়েকটি বাক্য ইংরেজিতে প্রকাশ করল যার অনুবাদ নিম্নরূপ।

'ভারতে এক নির্বোধ মহম্মদী মসীহ আছে, যে আমাকে বারবার লেখে যে যীশু মসীহ্‌র কবর ভারতে রয়েছে। লোকেরা আমাকে বলে, তুমি এর উত্তর দাও না কেন? সেই ব্যক্তিকে কেন চিঠি লেখ না? কিন্তু তোমাদের কি ধারণা আমি এই সব মশা-মাছির উত্তর দিব, যাদেরকে আমি পদপিষ্ট করে মেরে ফেলতে পারি?"

১৯০২ সালের ১৯শে ডিসেম্বর সে লেখে-

"আমার কাজ হল পূর্ব-পশ্চিম এবং উত্তর দক্ষিণের মানুষকে একত্রিত করা এবং এই শহর এবং অন্যান্য শহরে খৃষ্টানদের বসতি গড়ে তোলা। এমনকি সেই দিন উপস্থিত হয়, যেদিন মহম্মদের ধর্ম পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। হে খোদা! তুমি আমাদেরকে সেই দিন দেখাও।"

মোটকথা ইউরোপ ও আমেরিকা, এমনকি সমগ্র বিশ্বে আমার মোবাহালার প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর এই ব্যক্তির আস্ফালন ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। যা কিছু আমি নিজের এবং তার সম্পর্কে খোদা তা'লার কাছে সিদ্ধান্ত চেয়েছিলাম, নিশ্চয় তিনি সত্যিকার মীমাংসা করবেন আর খোদার সিদ্ধান্ত সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মাঝে পার্থক্য করে দেখাবে-এই প্রতীক্ষাতেই ছিলাম।

আমি সব সময় এ বিষয়ে খোদা তা'লার কাছে দোয়া করতাম এবং মিথ্যাবাদীর মৃত্যু কামনা করতাম। সুতরাং বেশ কয়েকবার খোদা তা'লা আমাকে সংবাদ দিলেন যে তুমি বিজয়ী হবে আর শত্রু ধ্বংস হবে। এরপর ডুইয়ের মৃত্যুর প্রায় পনেরো দিন পূর্বে খোদা তা'লা তাঁর বাণীর মাধ্যমে আমাকে আমার বিজয়ের সংবাদ দিলেন যেটি আমি ডুইয়ের মৃত্যুর প্রায় পনেরো দিন পূর্বে 'কাদিয়ান কে আর্য অউর হাম' নামে পুস্তিকার মলাটের প্রথম পাতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেছি যা নিম্নরূপ-

তাজা নিদর্শনের ভবিষ্যদ্বাণী

খোদা তা'লা বলেন, আমি একটি নতুন নিদর্শন প্রকাশ করব যাতে মহান বিজয় হবে। এটি সমগ্র পৃথিবীর জন্য একটি নিদর্শন হবে। (অর্থাৎ এই নিদর্শন কেবল ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না) আর সেটি হবে খোদার হাত দ্বারা স্বর্গলোক থেকে। প্রতিটি চোখ যেন তার প্রতীক্ষায় থাকে। কেননা অচিরেই খোদা সেই নিদর্শন প্রকাশ করবেন যাতে তা সাক্ষী দেয় যে যাকে সমস্ত জাতি গালি দেয়, সেই অধম খোদার পক্ষ থেকে। ধন্য সে, যে এর থেকে উপকৃত হয়।

ইশতেহার দাতা

মির্যা গোলাম আহমদ মসীহ মওউদ ইশহেতার ২০ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭

স্পষ্টতই, এই ডুই-এর মৃত্যুর নিদর্শন এমন নিদর্শন (যা মহান বিজয়ের কারণ) যা এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারত সহ সমগ্র বিশ্বের জন্য এক প্রকাশ্য নিদর্শন হতে পারে। কেননা আরও অন্যান্য সব নিদর্শন যেগুলি আমার ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি কেবল পাঞ্জাব এবং ভারত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল, আমেরিকা বা ইউরোপের কোনও ব্যক্তির কাছে সেগুলি প্রকাশ পাওয়ার সংবাদ ছিল না। কিন্তু এই নিদর্শনটি পাঞ্জাব থেকে ভবিষ্যদ্বাণী আকারে প্রকাশ পেয়ে আমেরিকায় এমন এক ব্যক্তির প্রেক্ষিতে পূর্ণতা লাভ করল যাকে ইউরোপ ও আমেরিকার ব্যাক্তি মাত্রই চিনত। আর তার মৃত্যুর সাথে সাথেই টেলিগ্রামের মাধ্যমে সে দেশের ইংরেজি সংবাদ পত্রিকাকে জানানো হয়। পায়োনিয়ার (এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত) পত্রিকা ১৯০৭ সালের ১১ মার্চ তারিখের সংখ্যায় এবং সিভিল, মিলিটারী গ্যাজেট (লাহোর থেকে প্রকাশিত) ১৯০৭ সালের ১২ মার্চ তারিখের সংখ্যায় এবং ইন্ডিয়ান টেলিগ্রাফ (লখনউ থেকে প্রকাশিত) ১৯০৭ সালের ১২ মার্চ তারিখের সংখ্যায় এই সংবাদটি প্রকাশ করেছে। এই প্রকারে প্রায় সারা বিশ্বে এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে। এই ব্যক্তি জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এমন মর্যাদার অধিকারী ছিল যে ঐশ্বর্যশালী নবাব এবং রাজপুত্রের মত সম্ভ্রম পেত। আমেরিকায় মুসলমান হয়ে যাওয়া ভিব আমাকে তার সম্পর্কে এই মর্মে একটি চিঠি লিখেছিল যে, ডক্টর ডুই এদেশে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও রাজকীয় জীবন যাপন করে। আমেরিকা ও ইউরোপে তার এই সম্মান ও খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও খোদার এমন কৃপা হল যে তার বিরুদ্ধে আমার মোবাহালার প্রবন্ধটি আমেরিকার নামিদামি দৈনিক সংবাদ পত্রিকাগুলি প্রকাশ করে দেয় এবং এটি ইউরোপ এবং আমেরিকায় ব্যাপক হারে প্রচারিত হয়। এর সর্বাত্মক প্রচারের পর তার মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীতে যে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল তা এমন সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হয় যার থেকে পূর্ণতররূপে প্রকাশ পাওয়া কল্পনা করা যায় না। তার জীবনের প্রতিটি দিক বিপন্ন হয়ে ওঠে। তার বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণ হয়, সূরাপানকে নিজের শিক্ষায় নিষিদ্ধ আখ্যায়িত করেছিল, অথচ সে নিজেই মদ্যপায়ী সাব্যস্ত হয়। সে নিজের গড়ে তোলা শহর 'সাইহুন' থেকে অপূর্ণ বাসনা নিয়ে বিতাড়িত হয়, যে শহরকে সে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে গড়ে তুলেছিল। এছাড়াও তার হাতে থাকা নগদ সাত কোটি টাকাও নিয়ে নেওয়া হয়। নিজের স্ত্রী ও সন্তান তার শত্রু হয়ে ওঠে। তার পিতা ইশতেহার দেয় যে সে জারজ সন্তান। এভাবে সে লোকের মধ্যে জারজ সন্তান সাব্যস্ত হয়। এছাড়া তার ব্যধিগ্রস্থদেরকে অলৌকিকভাবে সুস্থ করে তোলার দাবিও আস্ফালন ও মিথ্যা প্রমাণিত হয়। যাবতীয় প্রকারের লাঞ্ছনা তার ভাগ্যে জোটে এবং অবশেষে সে পক্ষাঘাত আক্রান্ত হয়। একটি কাষ্ঠখণ্ডের মত কিছু মানুষ তাকে এদিকে ওদিক বয়ে নিয়ে যেতে থাকে। অতিশয়

দুঃখের ভারে সে উন্মাদ হয়ে যায়, সে প্রবল মানসিক বিকারে জর্জরিত হয়। তার এই দাবিও কেবল ছলচাতুরি প্রমাণিত হয় যে আমি এখনও দীর্ঘজীবন লাভ করব আর আমি দিন দিন যুবক হচ্ছি আর অন্যেরা বৃদ্ধ হয়ে চলেছে। অবশেষে ১৯০৭ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে দুঃসহ বেদনা নিয়ে সে মারা গেল।

স্পষ্টতই এর থেকে উত্তম নিদর্শন আর কি হতে পারে? যেহেতু আমার প্রধান কাজ হল ক্রুশ ভঙ্গ করা। তাই তার মৃত্যুতে ক্রুশের একটি বড় অংশ ভেঙে গেল। । কেননা সে সমগ্র বিশ্বে প্রথম শ্রেণীর ক্রুশ-সমর্থক ছিল, যে কিনা নিজেকে নবী হওয়ার দাবি করত। সে বলত আমার দোয়ার সমস্ত মুসলমান ধ্বংস হবে আর ইসলাম বিলুপ্ত হয়ে যাবে, খানা কাবা পরিত্যক্ত হয়ে পড়বে।' তাই খোদা তা'লা তাকে আমার হাতে ধ্বংস করেছেন। আমি জানি, তার মৃত্যুতে শূকর বধের ভবিষ্যদ্বাণীটি স্পষ্টতার সঙ্গে পূর্ণ হয়েছে। কেননা এমন ব্যক্তির থেকে বিপজ্জনক কে হতে পারে যে কি না নবী হওয়ার মিথ্যাদাবী করেছে এবং শূকরের ন্যায় মিথ্যার আবর্জনা ভক্ষন করেছে। যেমনটি সে নিজেই লিখেছে, তার সঙ্গে এক লক্ষ মানুষের দল ছিল যারা অত্যন্ত বিত্তশালী ছিল, বস্তুত মুসায়লামা কাযযাব এবং আসওয়াদ আনসীও তার তুলনায় কিছুই ছিল না। না ছিল তাদের তার মত খ্যাতি, আর না ছিল তারা তার মত কোটি কোটি টাকার মালিক। অতএব আমি শপথ করে বলতে পারি, এ সেই শূকর ছিল যার বধ করার সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) সংবাদ দিয়েছিলেন যে মসীহ মওউদ-এর হাতে সে মারা যাবে। আমি যদি না তাকে মোবাহালার জন্য আহ্বান করতাম আর তার জন্য বদদোয়া করতাম কিম্বা তার মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করতাম, তবে তার মৃত্যু ইসলামের সত্যতার জন্য কোনও দলিল বলে গণ্য হত না। কিন্তু যেহেতু আমি শত শত পত্রিকায় পূর্বেই প্রকাশ করিয়েছিলাম যে সে আমার জীবদ্দশাতেই ধ্বংস হবে আর আমি মসীহ মওউদ আর ডুই মিথ্যাবাদী । আর আমি একথা বার বার লিখেছিলাম যে এর দলিল হল আমার জীবদ্দশাতে সে লাঞ্ছনাসহকারে নিজের অপূর্ণ বাসনা নিয়ে মারা যাবে। অতএব সে আমার জীবদ্দশাতেই মারা গেল। নবী করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে এর থেকে প্রকাশ্য নিদর্শন আর কি হবে। এখন সেই ব্যক্তিই এটিকে অস্বীকার করবে যে সত্যের শত্রু।

১১ *পাতার পর.....*

বলল, এ যুগের লোকেরা কেন নিদর্শন চায়? আমি তোমাকে সত্য সত্য বলছি, এ যুগের মানুষের জন্য কোনও নিদর্শন দেওয়া হবে না।..... অতঃপর অন্যত্র এর থেকেও আশ্চর্যের আরেকটি ঘটনা দেখুন, যখন মসীহকে ক্রুশে ঝোলানো হল, তখন ইহুদীরা বলল, সে অন্যদের পরিত্রাণ করতে পারে, কিন্তু নিজেকে নয়। সে যদি ইসরাঈলদের বাদশাহ হয়ে থাকে, তবে ক্রুশ থেকে নেমে আসুক। নিশ্চয় আমরা তার উপর ঈমান আনব। কিন্তু হযরত মসীহ নেমে আসতে পারেন নি।"

(জঙ্গে মুকাদ্দস, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৬, পৃ: ১৫৫-১৫৬)

তিনি আরও বলেন, মোবাহাসার শর্ত অনুসারে-

" আমার কথাগুলি ডেপুটি আব্দুল্লাহ্ আথামকে উদ্দেশ্য করে বলা। মহাশয়ের উচিত ইঞ্জিল শরীফে বর্ণিত বৈশিষ্ট্য অনুসারে সত্যিকার ঈমানদার হওয়ার লক্ষণগুলি নিজের সত্তায় প্রমাণ করা। অপরদিকে আমার জন্য আবশ্যক হবে প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার জন্য কুরআন করীমের প্রেক্ষিতে নিজেকে প্রকৃত ঈমানদার হিসেবে প্রমাণ করা। কিন্তু এস্থলে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে কুরআন করীম আমাদেরকে নিদর্শন প্রকাশের শক্তি প্রদান করেনি, বরং এমন কথায় আমার শরীরে ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি জানি না তিনি কোন প্রকারের নিদর্শন দেখাবেন। তিনিই খোদা, তিনি ছাড়া অন্য কোনও খোদা নেই। এটি আমার পক্ষ থেকে একথার দৃঢ় অঙ্গীকার। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা আমার নিকট প্রকাশ করেছেন যে, মোকাবেলার সময় অবশ্যই আমি জয়ী হব। কিন্তু একথা জানি না যে খোদা তা'লা কিভাবে নিদর্শন দেখাবেন। আসল কথা হল, নিদর্শন এমন হওয়া উচিত যে তা যেন মানবীয় শক্তিবৃত্তির উর্দ্ধে হয়।"

(জঙ্গে মুকাদ্দস, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৬, পৃ: ১৫৭)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই উত্তর লিপিবদ্ধ করানো মাত্রই পাদ্রী সাহেবগণ সেই সব ব্যধিগ্রস্থ ব্যক্তিদেরকে সভাস্থল এমনভাবে উধাও করে দিলেন, মনে হল যেন ভু-পৃষ্ঠ তাদেরকে গিলে ফেলেছে। পাদ্রীদের এই প্রলুব্ধকর পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে বিফলে গেল। আর চিরতরে তাদের ললাটে কলঙ্কের ছাপ পড়ে রইল। উল্টে তারা খোদার বীরসিংহ, ক্রুশখণ্ডনকারীর সুস্পষ্ট বিজয়ের কারণ হল।

নিদর্শন

নিদর্শন প্রকাশের নিমিত্তে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সবিনয় দোয়া ও অনুনয় পরিশেষে গ্রহণীয়তার মর্যাদা লাভ করল। আল্লাহ্ তা'লা প্রতিপক্ষের বিষয়ে এই নিদর্শন সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই সংবাদ দিয়েছিলেন, যা এই খণ্ডের ২৯১ ও ২৯২ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে।

মোটকথা দাজ্জালী জাতি ও প্রতিশ্রুত মসীহ্র মাঝে সংঘটিত এই পবিত্র যুদ্ধ ক্রুশীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে এবং অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের প্রেক্ষিতে চিরতরে দাজ্জাল নিধন সম্পন্ন হয়।

এই বিতর্কের সুখকর পরিণাম বিতর্কচলাকালীনই প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। বিতর্কের দিনগুলিতে মিঞা নবী বখশ সাহেব সওদাগর অমৃতসর এবং হাদীস ও ফিকাহ্র যোগ্য শিক্ষক হযরত কাযি আমীর হোসেন (রা.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে সেলসেলা আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হন। কাযি সাহেব সেই সময় অমৃতসরের মাদরাসা ইসলামিয়ায় শিক্ষকতা করতেন। তাঁর আহমদী হওয়ায় মৌলবীদের বাড়িতে শোরগোল বেঁধে যায়।

(নুর আহমদ পত্রিকা, পৃ: ৩০)

অনুরূপভাবে কপুরথলার জনৈক ধনাঢ্য কর্ণেল আলতাফ আলি খান সাহেব ইসলাম গ্রহণ করেন, যিনি পূর্বে খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করেছিলেন আর মোবাহাসা চলাকালীন তিনি খৃষ্টানদের দলে বসেছিলেন (রিভিউ অফ রিলিজিয়নস, উর্দু, জানুয়ারী, ১৯৪০)। খৃষ্টান পাদ্রীরা জেনে গেছিল যে তাদের বিপক্ষে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলামের একজন অসাধারণ যোদ্ধা আর তিনি তাদের ধর্মের বিপক্ষে ও ইসলামের সমর্থনে যে ধর্মীয় জ্ঞান রাখেন তা এমন এক অস্ত্র যার আঘাতে ক্রুশ ভেঙে চুরমার হওয়া অনিবার্য। এই অসাধারণ মোবাহাসায় প্রথিতযশা পাদ্রীদের পরাজয় এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে ভঙ্গিতে ইসলামকে জীবিত ধর্ম, আঁ হযরত (সা.)কে জীবিত নবী এবং কুরআন মজীদকে জীবিত গ্রন্থ হিসেবে উপস্থাপন করেন যে খৃষ্টজগতের উপর এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। যে ইংল্যান্ডের বহু মিশনারী সোসাইটি পাঞ্জাব ও ভারতের কাজ করছিল, তারাও এর দ্বারা প্রভাবিত হল। ১৮৯৪ সালে বিশ্বব্যাপী পাদ্রীদের লন্ডনে যে মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল, তার একটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার সময় লর্ড বিশপ অফ গ্লুস্টার রেভারেন্ড চার্লস জন এলিকোট বলেন:

"ইসলামে এক নতুন আলোড়নের লক্ষণ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাদের অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আমাকে বলেছে, ভারতের বিট্রিশ সাম্রাজ্যে আমরা এক নতুন শৈলীর ইসলামের সম্মুখীন হচ্ছি। আর এই দ্বীপরাষ্ট্রেও কোথাও কোথাও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।.. এরা সেই সকল 'বিদাত'-এর ঘোর বিরোধী, যার কারণে মহম্মদ (সা.)-এর ধর্ম আমাদের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এই নতুন ইসলামের কারণে মহম্মদ (সা.) পূর্বের ন্যায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তন খুব সহজেই সনাক্ত করার মত। এছাড়াও এই নতুন ইসলাম চরিত্রগতভাবে কেবল রক্ষণশীলই নয়, বরং প্রবল পরাক্রমের অধিকারী। আক্ষেপ কেবল এতটুকুই যে, আমাদের মধ্যে কতকের মন সেদিকে আকৃষ্ট হচ্ছে।"

(দি অফিশিয়াল রিপোর্ট অফ দি মিশনারী কনফারেন্স অফ দি ইংলিশ কমিউনিয়ন, ১৮৯৪, পৃ: ৬৪)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দাবীর পর চার বছর যেতে না যেতেই পাদ্রীদেরকে তাঁর পরাক্রম গ্রাস করে আর খৃষ্টান জগত অনুভব করল যে ইসলামের বিজয় সমাগত এবং খৃষ্টবাদের পতন অনিবার্য।

****❖****❖****❖****

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

পত্রিকায় আর্য সমাজের নেতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতি আত্মা সম্পর্কে নিজের এই মতবাদ পেশ করে-

"আত্মা অনাদি এবং তা এত অধিক পরিমাণে আছে যে, পরমেশ্বরও এর সংখ্যা সম্পর্কে জানেন না। এই কারণে তারা চিরকাল মুক্তি পেতে থাকে এবং অনন্তকাল পেতে থাকবে, কখনও ধ্বংস হবে না।"

এটি আল্লাহ্ তা'লার চরম অসম্মান ছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তা সহ্য করতে পারতেন না। তিনি ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে এর দাঁতভাঙ্গা উত্তর দেন এবং এই ভ্রান্ত মতবাদকে খণ্ডণ করেন। তিনি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন:

স্বামী দয়ানন্দ-এর অনুগামীরা সহ যে ব্যক্তি একথা প্রমাণ করবে যে আত্মা অনন্ত ও অসীম আর পরমেশ্বর তাদের সংখ্যা জানেন না, আমি তাকে পাঁচ হাজার রুপি পুরস্কার হিসেবে দিব।

এটি ধর্মীয় জগতে আর্য সমাজের জন্য প্রথম পুরস্কার ছিল, যা তিনি উপস্থাপন করেছিলেন। এই বিষয়টি আর্য শিবিরে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। লাহোরের আর্য সমাজের সেক্রেটারী লালা জীবন দাসকে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর সাধারণ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অত্যন্ত তড়িঘড়ি এই বিবৃতি দিয়ে অবস্থা সামলাতে হয় যে, এই বিষয়টি আর্যসমাজীদের নীতির মধ্যে পড়ে না। যদি আর্য সমাজের কোনও সদস্য এর দাবিদার থাকে, তবে তাকে প্রশ্ন করা উচিত এবং তাকেই উত্তর দেওয়া আবশ্যক।"

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫৩)

১৮৮০-১৮৮৪ পর্যন্ত বারাহীনে আহমদীয়ার চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর প্রথম রচনা ছিল। এটি সেই যুগ ছিল, যখন কি না খৃষ্টবাদ, আর্যসমাজ, এবং ব্রহ্মসমাজ অত্যন্ত সংগঠিতভাবে ইসলামের উপর আক্রমণমুখী ছিল। ইসলাম এদের ক্রমাগত আক্রমণে দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। বারাহীনে আহমদীয়া প্রকাশিত হয়ে যখন জনসমক্ষে এল, তখন মুসলমানেরা যেন প্রাণ ফিরে পেল। তিনি এই পুস্তকটি রচনা করেছিলেন সমস্ত ধর্মের সামনে ইসলামের সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে। এর মধ্যে তিনশটি মজবুত ও শক্তিশালী দলিল উপস্থাপন করা হয়েছিল। তিনি চ্যালেঞ্জ জানান যে যদি কেউ এর দলিলগুলি খণ্ডন করে দেখায়, এমনকি অর্ধেক বা এক পঞ্চমাংশও যদি খণ্ডন করে দেখায়, তবে দশ হাজার টাকার পুরস্কার দেওয়া হবে।

এই রচনা হাতে পেয়ে মুসলমানেরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। তারা আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিল যে ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য কোনও এক যোদ্ধা ময়দানে এসেছে। বস্তুত হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কেবল ইসলামের প্রতিরক্ষায় করেন নি, বরং ইসলামের সত্যতার অকাট্য যুক্তি প্রমাণ সহকারে এমন প্রবলভাবে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন যে, বিরোধীরা হতচকিত হয়ে পড়ে। প্রতিটি শিক্ষিত মুসলমান পরিবার বারাহীনে আহমদীয়া অধ্যয়নকে আবশ্যক মনে করতে আরম্ভ করল। উলেমাগণ এর উপর তাদের মূল্যবান মন্তব্য লিখল। মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী লিখল, চৌদ্দশ বছরে এমন গ্রন্থ রচিত হয় নি। যদি এর তুল্য কোন গ্রন্থ থেকে থাকে যার মধ্যে ভিন্ন ধর্মের বিরুদ্ধে এমন যুক্তি-প্রমাণ পাওয়া যায় তবে কেউ আমাকে সন্ধান দিক। লুধিয়ানার সুফি আহমদ জান সাহেবও জোরালো মন্তব্য করেন এবং মনেপ্রাণে এই পুস্তকের অনুরাগী হয়ে পড়েন। তিনি একটি পঙক্তিতে বলেন-

হাম মরীযোঁ কি হ্যা তুমহি পর নযর, তুম মসীহা বনো খোদা কে লিয়ে।

অর্থাৎ আমরা ব্যধিগ্রস্তের দল তোমার পানেই চেয়ে আছি, খোদার দোহাই, তুমি আমাদের পরিত্রাতা হও।"

বারাহীনে আহমদীয়ার সৌন্দর্য, শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর উত্তরের জন্য দশ হাজার টাকার পুরস্কারের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

এই পুস্তক প্রত্যাখ্যানকারীদের জীবনকে তিক্ত করে তুলবে।

এই গ্রন্থের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, এতে ইসলামের শত্রুদের অযৌক্তিক আপত্তির খণ্ডন ও ইসলামের সত্যতার প্রমাণ অতি উত্তমভাবে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ এতে বিরোধীদের জন্য ১০০০০ রুপি পুরস্কারের চ্যালেঞ্জ সম্বলিত একটি বিজ্ঞাপনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেন তাদের আর কোন ওজর-আপত্তির সুযোগ না থাকে। এই বিজ্ঞাপন, বিরোধীদের মাথায় অনেক বড় একটি বোঝা, যা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত অব্যহতি পাওয়া তাদের জন্য সম্ভব নয়। এছাড়া এটি তাদের সত্যবিবর্জিত জীবনকে এমনভাবে তিক্ত করে তুলবে যার অভিজ্ঞতা কেবল তাদেরই হবে। বস্তুত এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সত্যান্বেষীদের জন্য অতি কল্যাণময় একটি গ্রন্থ যার মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা হবে সুস্পষ্ট, সমুজ্জ্বল ও সূর্যের মত দেদীপ্যমান আর সেই পবিত্র গ্রন্থের মাহাত্ম্য ও সম্মান উদ্ভাসিত হবে যার সাথে ইসলামের সত্যতা, মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সম্পৃক্ত।

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১, পৃ: ৯)

ইসলাম, ইসলামের প্রবর্তক এবং কুরআনের সত্যতা প্রকাশ পেল

এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য হল ইসলাম ধর্মের সত্যতা প্রমাণ, কুরআন করীমের সত্যতার অনুকুলে যুক্তি প্রদান এবং হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর রিসালতের সত্যতার প্রমাণ সবার সামনে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন। এছাড়া, যুক্তি প্রমাণে দৃঢ় এই ধর্ম, এই পবিত্র গ্রন্থ এবং এই মনোনীত নবীকে যারা অস্বীকার করে , তাদেরকে উৎকৃষ্ট ও যুক্তিনির্ভর প্রমাণাদির মাধ্যমে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো ও নির্বাক করে দেওয়া, যেন ভবিষ্যতে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে মুখ খোলার ধৃষ্টতা না দেখায়।

(বারাহীনে আহমদীা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১, পৃ: ২৩)

ভ্রান্ত মতবাদের ধর্ম জবেহ হয়ে গেছে, আর কখনও জীবিত হবে না

বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে তিন'শ সুদৃঢ় দলিল দ্বারা ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীর ভ্রান্ত মতবাদের এমনভাবে মূল উৎপাটন করা হয়েছে যেন সেই ধর্মকে জবেহ করা হয়েছে, আর কখনও জীবিত হবে না।

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১, পৃ: ১৩৪)

এর উত্তর কেয়ামত পর্যন্ত কেউ দিতে পারবে না

এই পুস্তক সত্যান্বেষীদের জন্য সুসংবাদ এবং ইসলামের অস্বীকারকারীদের জন্য এক ঐশী প্রমাণ, যার উত্তর কিয়ামত পর্যন্ত তারা খুঁজে পাবে না। এই কারণেই এর সঙ্গে ১০০০০ রুপি পুরস্কার সম্বলিত একটি ইশতেহারও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদী এবং ইসলামের শত্রু, যারা ইসলামের সত্যতাকে অস্বীকার করে,তাদের উপর চূড়ান্ত যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা নিজেদের ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও মিথ্যা বিশ্বাস নিয়ে দম্ভ না করে।

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১, পৃ: ৮৩)

এই পুস্তক ইসলামের জন্য মহান বিজয়

ধর্মের প্রতি উদাসীনতার কারণে যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়েছে তার সংশোধন নির্ভর করছে ধর্মীয় জ্ঞানের প্রসারের উপর। অতএব, এই উদ্দেশ্যকেই সর্বতোভাবে পূর্ণ করার লক্ষ্যে আমি বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকটি রচনা করেছি। আর এই পুস্তকে এমন আড়ম্বরসহকারে ইসলামের সত্যতা প্রমাণ দেখানো হয়েছে যাতে বিবাদের চিরাবসান ঘটবে মহান বিজয়ের সঙ্গে। "

(বারাহীনে আহমদীা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১, পৃ: ৬৯)

দোহাই আপনাদের,

আমার এই পুস্তকের মোকাবেলা করার জন্য আপনারা বের হোন।

দোহাই আপনাদের ! ক্ষণকালও বিলম্ব না করে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্লেটো হওয়ার ভান করুন, ব্যেকনের বেশ ধরুন, এরিস্টোটলের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা ধার নিন, আর নিজেদের কল্পিত খোদার আগে করজোড়ে সাহায্য চাইতে থাকুন; এরপর দেখুন, আমাদের খোদা জয়যুক্ত হন- নাকি আপনাদের মিথ্যা উপাস্যরা। মনে রাখবেন, এ গ্রন্থের জবাব যতক্ষণ না দিচ্ছেন ততক্ষণ বাজারে পশুতুল্য গণ-মানুষের সামনে ইসলামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং হিন্দুদের মন্দিরে আসন গেঁড়ে বসে একমাত্র বেদকে ঈশ্বরের সৃষ্টি ও সত্য-জ্ঞান আখ্যা দেওয়া আর বাকী সকল বার্তাবাহক বা অবতারদের প্রতারক আখ্যায়িত করা লজ্জা-শরম বিবর্জিত কাজই হবে।

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১, পৃ: ৫৬)

পুস্তকের ছয়টি উপকারিতা

এ গ্রন্থের প্রধানত কল্যাণকর দিক হল: গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়াদি লিখতে গিয়ে এতে দুর্বল কোন কথা লিখা হয় নি বরং সে সকল সত্য বিষয়াদী যার ওপর ধর্মীয় জ্ঞানের নীতিমালা নির্ভরশীল আর সে সকল সুমহান তত্ত্বাবলী যার সামগ্রিক রূপের নাম হলো ইসলাম, এর সবকিছু এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর এটি এমন একটি লাভজনক ও কল্যাণকর কাজ যে, এর পাঠকদের সকল ধর্মীয় চাহিদা এতে পরিবেষ্টিত আর কোন বিভ্রান্তকারী ও প্ররোচকের ফাঁদে তারা আর পা দেবে না বরং অন্যদের বুঝানো, হিতোপদেশ দেওয়া ও সঠিক পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে এটি উৎকর্ষ শিক্ষক ও যোগ্য পথপ্রদর্শক সাব্যস্ত হবে।

এ গ্রন্থের দ্বিতীয় উপকারিতা হলো: ইসলাম ও ইসলামী নীতি সংক্রান্ত সত্যতার তিনশত দৃঢ় ও অকাট্য প্রমাণাদির সমন্বয়ে এটি প্রণীত, যা দেখে পুরোপুরি অন্ধ এবং বিদ্বেষের ভয়াবহ অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্যক্তি ছাড়া সকল সত্যান্বেষীর জন্য এই সুদৃঢ় ধর্ম অর্থাৎ ইসলামের সত্যতা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এ গ্রন্থের তৃতীয় উপকারিতা হলো: ইহুদী, খ্রিষ্টান, তারকাপূজারি, আর্যব্রাহ্ম, প্রতিমাপূজারি, নাস্তিক, প্রকৃতিপূজারি, কুসংস্কারপন্থি, বিধর্মী- এক কথায় আমাদের যত ধরণের বিরোধী আছে তাদের সকলের সন্দেহ-সংশয় ও কুমন্ত্রণার সমাধান বা উত্তর এতে রয়েছে। আর উত্তরও এমন যে মিথ্যাচারীদের মুখ তাদের নিজেদেরই যুক্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আপত্তির কেবল খণ্ডনই করা হয় নি, বরং প্রমাণ করে দেখানো হয়েছে যে, যে বিষয়কে দুর্বল চিন্তাধারার মানুষ আপত্তির কারণ ভেবেছে, সত্যিকার অর্থে তা এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে অন্যান্য গ্রন্থের ওপর কুরআনের শিক্ষামালার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রমাণিত, আপত্তির সুযোগ থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। আর সেই শ্রেষ্ঠত্ব এত স্পষ্ট প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যার ফলে আপত্তিকারী স্বয়ং আপত্তির লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে।

চতুর্থ উপকারিতা হলো: এতে ইসলামী নীতির বিপরীতে বিরোধীদের ধর্মীয় নীতি সম্পর্কেও সুগভীর গবেষণা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাদের যে সব নীতি ও বিশ্বাস সত্য-বিবর্জিত, কুরআনী শিক্ষার মোকাবিলায় সে সবের অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে, কেননা, প্রত্যেক অমূল্য রত্নের মূল্য তুলনার মাধ্যমেই বোঝা যায়।

এই গ্রন্থের পঞ্চম উপকারিতা হলো: এটি পাঠ করলে ঐশী বাণীর তথ্য ও তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হবে আর সেই পবিত্র গ্রন্থের তত্ত্ব ও প্রজ্ঞা সবার সামনে প্রকাশ পেয়ে যাবে, যে প্রাণসঞ্জীবনী জ্যোতি হতে ইসলামের জ্যোতি উৎসারিত। কেননা, সে সকল যুক্তি ও প্রমাণ যা এতে লেখা হয়েছে আর সে সকল পরমোৎকর্ষ সত্য যা এতে প্রদর্শন করা হয়েছে, তা কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত থেকেই নেওয়া। খোদা নিজ গ্রন্থে যে সকল যুক্তিগত প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন সে সকল যুক্তিগত প্রমাণই এতে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এই ব্যবস্থার আওতাধীনে কুরআন শরীফের প্রায় ১২ পারা এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। অতএব, এ গ্রন্থ সত্যিকার অর্থে কুরআন শরীফের সূক্ষ্ম বিষয়াদি ও তত্ত্ব-দর্শন তুলে ধরার জন্য এক বাগ্মিতাপূর্ণ তফসীর যা পাঠ করলে প্রত্যেক সত্যান্বেষীর কাছে স্বীয় সম্মানিত মনিবের অনন্য গ্রন্থের সুউচ্চ মর্যাদা বিশ্বকে আলোকিতকারী সূর্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল হয়ে ধরা দেবে।

এ গ্রন্থের ষষ্ঠ উপকারিতা হলো: এতে আলোচিত বিষয়াদি গভীর দৃঢ়তা, উৎকৃষ্টতা ও যুক্তি প্রদানের সৌন্দর্য অক্ষুন্ন রেখে অথচ অত্যন্ত সহজভাবে পরম সৌন্দর্য, ভারসাম্য ও সূক্ষ্মতার মানদণ্ডের নিরিখে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি এমন একটি রীতি যা জ্ঞানের প্রসার ও চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির দৃঢ়তার জন্য এক উন্নত মাধ্যম সাব্যস্ত হবে। কেননা,সঠিক যুক্তি-প্রমাণ সম্পর্কে প্রণিধান ও এর ব্যবহারে মনন-শক্তি দৃঢ় হয় আর সূক্ষ্ম বিষয়াদি বুঝার ক্ষেত্রে বুদ্ধি-বিবেচনা শক্তি ক্ষুরধার হয়ে ওঠে। সঠিক যুক্তির অনুশীলন ও অনুসরণের কারণে হৃদয় সত্যের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া সকল বিতর্কিত বিষয়ের প্রকৃত ও সত্যিকার রূপ উদ্ঘাটনের এমন এক পরমোৎকর্ষ যোগ্যতা ও দক্ষতা সৃষ্টি হয়ে যায় যা বুদ্ধিবৃত্তির সম্পূর্ণতার কারণ এবং মানুষের যুক্তিপ্রিয় সত্ত্বার জন্য পরম পরাকাষ্ঠাস্বরূপ, যার ওপর নির্ভর করে মানুষের সমূহ সৌভাগ্য ও সম্মান।

لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ -এর ভবিষ্যদ্বাণীটি অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ সহকারে পূর্ণ হয়েছে।

যেহেতু দয়ালু খোদা বিশেষ উপকরণের সঙ্গে এই অধমকে বিশিষ্ট করেছেন এবং এমন যুগে সৃষ্টি করেছেন যা প্রচারের পূর্ণতার জন্য যারপরনায় সহায়ক। এই কারণে তিনি স্বীয় কৃপা ও অনুগ্রহধারায় এই সুসংবাদ দান করেছেন যে আদি থেকে এই নিয়ম চলে আসছে যে উপরোক্ত আয়াত (لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ) এবং وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ আয়াতের আধ্যাত্মিকভাবে সত্যায়নস্থল হল এই অধম। এবং খোদা তা'লা স্বয়ং সেই সব যুক্তি-প্রমাণ ও কথাগুলিকে বিরুদ্ধবাদীদের কাছে পৌঁছে দিবেন, যেগুলি এই অধম বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ্যে লিখেছিল। আর তাদের পরাস্ত ও নিরুত্তর হওয়া জগতের সামনে প্রকাশ করে উপরোক্ত আয়াতের অর্থ পূর্ণ করবেন। ফালহামদোল্লিহি আলা যালিক

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন,১ম খণ্ড-পৃ: ৫৯৯-এর টীকা)

পাঠকবর্গ! হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছিলেন, যুক্তি-প্রমাণের উত্তর কিয়ামত পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারবে না। একশ চল্লিশ বছর পেরিয়ে গেছে, কেউ এর উত্তর দেয় নি। কেয়ামত পর্যন্ত কেউ এর থেকে নিস্তার পেতে পারে না।

****

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।

Email: banglabadar@hotmail.com

যুগ ইমামের বাণী

"দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমানিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।" (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)